তাওহীদের ডাক

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১১

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১

সাক্ষাৎকার :
মুহতারাম আমীরে জামা'আত

- শী'আ মতবাদের বিস্তৃতি
- স্মৃতিচারণ : অবশেষে পীস টিভিতে
- এক খোদা ইনসান বান গিয়া
- সেব্রিনিসায় মুসলিম নিধন
- আত্মসমালোচনা

তাওহীদের ডাক

The Call to Tawheed

৮ম সংখ্যা
নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১১

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সম্পাদক
মুযাফফর বিন মুহসিন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
নূরুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক
আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

যোগাযোগ
তাওহীদের ডাক
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪
মোবাইল : ০১৭৪৪৫৭৬৫৮৯
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েব : www.at-tahreek.com/tawheederdak

মূল্য : ১৫ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার বিভাগ, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও সোনালী প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** — ২
- **কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা** — ৩
- **তানযীম** — ৫
  নেতৃত্বের পরিচয় ও প্রকৃত গুণাবলী
  অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
- **তারবিয়াত** — ৭
  আত্মসমালোচনা
  আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
- **তাজদীদে মিল্লাত** — ১১
  শী'আ মতবাদের বিস্তৃতি
  আব্দুল আলীম বিন কাওছার
- **আহলেহাদীছ আন্দোলন** — ১৫
  আহলেহাদীছ আন্দোলন : তাকলীদী যুগে
  ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **স্মৃতিচারণ** — ১৮
  অবশেষে পীস টিভিতে
  মুযাফ্ফর বিন মুহসিন
- **বিশেষ নিবন্ধ** — ২২
  দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ১৯৯৬-এ প্রদত্ত
  আমীরে জামা'আতের ভাষণ
  কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১ : প্রেক্ষাপট ও প্রত্যাশা — ২৪
  ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ
- **সাক্ষাৎকার** — ২৭
  মুহতারাম আমীরে জামা'আত
- **সাময়িক প্রসঙ্গ** — ৩১
  ওসামা ট্র্যাজেডি এবং 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র আরেক ভেল্কি
  আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম
- **পরশ পাথর** — ৩৪
  মুহিব্বুল্লাহ : এক খোদা ইনসান বান গিয়া
  মাওলানা মেছবাহুদ্দীন
- **ইতিহাসের পাতা থেকে** — ৩৯
  সেব্রেনিসা গণহত্যা : ইতিহাসের কালো অধ্যায়
  ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- **তারুণ্যের ভাবনা** — ৪৩
  ধর্ম নিয়ে বিতর্ক
  এমদাদ বিন মোযাম্মেল
- **ভ্রমণ** — ৪৫
  ঘুরে এলাম দার্জিলিং ও ভুটান
  আব্দুর রশীদ
- **জীবনের বাঁকে বাঁকে** — ৪৯
- **কবিতা** — ৫২
- **সংগঠন সংবাদ** — ৫৩
- **সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব** — ৫৪
- **সাম্প্রতিক বাংলাদেশ** — ৫৫
- **সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক** — ৫৫
- **আইকিউ** — ৫৬

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১

‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কর্মীদের সর্বোচ্চ স্তর ও মান হ’ল ‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য’। সংগঠনের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাউন্সিল সদস্যগণ অগ্রগতির পথে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে আসছেন।

যুগ যুগ ধরে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন আহলেহাদীছগণ। অহি-র বিধানের মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় তারাই সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন অকুতোভয়ে। বদর-ওহোদ-খন্দকের ধারাবাহিকতায় ইসলাম ও দেশের মর্যাদা রক্ষায় তারা প্রাণ উৎসর্গ করে গেছেন ক্লান্তিহীন চেতনায়। উপমহাদেশের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন তার জ্বলন্ত সাক্ষী। কিন্তু পরবর্তীতে এই ঐতিহাসিক সম্মান ও ঐতিহ্য ক্ষুণ্ন হ’তে শুরু করেছিল এবং আহলেহাদীছ সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছিল এভাবে যে, রাফউল ইয়াদায়েন করা, বুকের উপর হাত বাঁধা ও সরবে আমীন বলাই তাদের কাজ। অন্যদের কারো ধারণা ইসলাম কেবল ভুয়া ফযীলতের কিতাবের মধ্যে বন্দী, কারো বিশ্বাস খানকা-মাযার ও ওরসের মাঝেই ইসলাম সীমাবদ্ধ। কেউ দ্বীন কায়েমের নামে মাযহাবী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। কেউ সময় ব্যয় করছে মানবরচিত মিথ্যা দর্শনের পিছনে। কেউবা পাশ্চাত্যের সৃষ্ট ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি বিধর্মীয় মতবাদের মধ্যে জনকল্যাণের স্বপ্ন দেখছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল এই সব বাতিল মতবাদীদের লোভনীয় শিকার। আহলেহাদীছ ছাত্র ও তরুণরাও এ সবের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

এমতপ্রেক্ষিতে তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার দাওয়াত নিয়ে ময়দানে আবির্ভূত হ’লেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহানগরীর ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে ১৯৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী গড়ে তুললেন **‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’।** শুরু হ’ল যাত্রা। আহলেহাদীছ নওজোয়ানদের এই সংগঠন হয়ে দাঁড়াল জান্নাত পাগল মানুষের মুক্তির দিশারী, মহাসত্যের যাত্রাপথের আলোর মশাল। কিন্তু বিদ‘আতীদের জন্য হল চরম আতঙ্ক। ত্রাস হয়ে উঠল জাহেলী মতবাদের ধ্বজাধারীদের জন্য। আহলেহাদীছের পরিচয় দিয়ে যারা আহলেহাদীছ সমাজকে অন্যের বশংবদ লেজুড়ে পরিণত করেছিল, তাদের জন্য হয়ে উঠল এক মরণজ্বালা।

শিরক, বিদ‘আত ও নব্য জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলনের শুভ সূচনা করার কারণে যুবসংঘের সামনে এসেছে হাযারো বাধা। পথ ছিল কন্টকাকীর্ণ। গীবত-তোহমত, গালি-গালাজ, হিংসা-বিদ্বেষ, যুলুম-অত্যাচার, লোমহর্ষক নির্যাতন, অফিস ভাংচুর, বসত বাড়ীতে আগুন লাগানো, সম্পদ লুণ্ঠন থেকে শুরু করে এমন কোন জঘন্য কর্ম নেই যা তাদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করা হয়নি। অবশেষে মিথ্যা মামলা ও কারাগারের লৌহ কপাট।

এরপরও এই অদম্য তাওহীদী কাফেলা তার নিজস্ব নীতি-আদর্শ থেকে একচুল বিচ্যুত হয়নি। সংগ্রামী চেতনায় এগিয়ে চলেছে সম্মুখে। ১৯৭৯ সালে ঢাকায় কবর পূজারীদের ইট-পাথরকে তোয়াক্কা করেনি, ১৯৮০ থেকে অব্যাহত গীবত-তোহমত-হিংসা ও চোখরাঙ্গানীর দিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি, মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফীকে হারানোর ব্যথায় ভেঙ্গে পড়েনি, ১৯৮৯-এর ‘সম্পর্কহীনতা’ ঘোষণা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি, ২০০1 সালে কপটদের বিভ্রান্তির কবলে পড়েনি, ২০০৫-এর সরকারী জেল-যুলুম ও নির্যাতনকে পরওয়া করেনি, ২০০৬-সালে নোংরা দলবাজিকে পাত্তা দেয়নি, ২০০9 সালে আপতিত বাধাকে তোয়াক্কা করেনি। যাবতীয় বাধা ডিঙ্গিয়ে সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। যাবতীয় ষড়যন্ত্রের শিকড় উপড়ে ফেলেছে; গুঁড়িয়ে দিয়েছে শিরক-বিদ‘আত ও জাহেলিয়াতে ভিত। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

এভাবেই পেরিয়ে গেল ৩৩টি বছর। এরই মাঝে অনেক কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য চির বিদায় নিয়েছেন। অনেক নতুন ভাই সামনে এসেছেন। ঈমানের পরীক্ষায় ছিটকে পড়েছেন। ৩৩ বছরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে যদি ১৯৭৮ সালের দিকে পিছন ফিরে তাকাই, তবে বিশ্বাসই হবে না যে, সেদিনের ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ আজ এক পূর্ণ-পরিণত জাতীয় সংগঠন। ১৯৮১ সালের ৭ই জুনে সৃষ্টি হয়েছে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, ১৯৭৯ সালে যাত্রা শুরু হয়েছে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন’ বইয়ের, ১৯৮০ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকায় ঐতিহাসিক সেমিনার ও জাতীয় সম্মেলন, ১৯৮৬-এর ২১-২২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সম্মেলন। সেখান থেকে এসেছে- ‘সমাজ বিপ্লবের ধারা’ ও ‘তিনটি মতবাদ’ বই, ১৯৮৯-এর ৫ই সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সমাজকল্যাণ সংস্থা ‘তাওহীদ ট্রাস্ট’, ১৯৯১ সালে রাজশাহী মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহলেহাদীছদের সর্ববৃহৎ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’, ১৯৯২-এর ১৫ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’, ১৯৯৪ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুরব্বী সংগঠন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ ও জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন ‘সোনামণি’, ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনের তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ জ্ঞানসাগর ডক্টরেট থিসিস- **‘আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ’,** ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে দেশ ও বিদেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গবেষণা পত্রিকা **মাসিক আত-তাহরীক**, ১৯৯৮ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর উপমহাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আহলেহাদীছদের প্রথম ফাতাওয়া বোর্ড ‘দারুল ইফতা’, একই সালে প্রকাশিত হয় সর্বাধিক তত্ত্ব ও তথ্যবহুল ছালাত শিক্ষার বিশুদ্ধ বই ‘ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আহলেহাদীছদের প্রথম মহিলা মাদরাসা, ২০১০ সালের ১লা ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয় কেন্দ্রীয় গবেষণা বিভাগ। সময়ের বাঁকে বাঁকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এভাবেই গড়ে উঠেছে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

প্রবীণ ও নবীনদের সমন্বয়ে স্মৃতি ও ঐতিহ্যের স্মারক হিসাবে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন’১১। এ সম্মেলন সংগঠনের অগ্রযাত্রার পথে অবদান রাখতে পারে আক্বাবায়ে কুবরার শপথের মত। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবিস্মরণীয় ত্যাগের বিনিময়ে ইসলাম মদীনা থেকে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই আমাদের প্রধান দায়িত্ব হল- আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আসা অভ্রান্ত সত্যকে ঐক্যবদ্ধভাবে শক্ত করে হাতে-দাঁতে আঁকড়ে ধরা। ক্ষুদ্র বিষয়কে ক্ষুদ্র ভেবে বৃহত্তর বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া। যাবতীয় কার্যবিধি আল্লাহ্‌র দিকে সোপর্দ করা এবং তাঁরই কাছে উত্তম প্রতিদান প্রার্থনা করা।

আজ যারা প্রবীণ তাদের দায়িত্ব শেষ হয়নি। আমরা তাঁদেরকে আগামী দিনের তরুণ ছাত্র ও যুবকদেরদের উৎসাহ দেওয়ার আহ্বান জানাব। যেমনভাবে ওয়ারাক্বা বিন নওফেল বৃদ্ধ বয়সে রাসূল (ছাঃ)-কে উৎসাহ দিয়েছিলেন: ‘হায় আক্ষেপ! আমি যদি সেদিন থাকতাম! আফসোস! যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে সেদিন যদি আমি জীবিত থাকতাম! বিস্মিতচিত্তে রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, আমাকে কি তারা বহিষ্কার করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! তুমি যা নিয়ে এসেছ তা নিয়ে ইতিপূর্বে যিনিই এসেছেন তার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র হয়েছে। আমি যদি সেদিন বেঁচে থাকি তাহলে আমি সর্বশক্তি দিয়ে তোমাকে সাহায্য করব’।

নবীনদের জন্য স্মরণ করিয়ে দেব আমাদের ‘কর্মপদ্ধতি’ বইয়ের দু’টি লাইন- ‘কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যগণ হবেন ছাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনের প্রতিমূর্তি। আল্লাহ্‌র ভয়ে তারা যেমন থাকবেন সদা সন্ত্রস্ত, তেমনি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশতের অতুলনীয় পুরস্কার লাভের আশায় থাকবেন সদা কর্মচঞ্চল’। আল্লাহ আমাদেরকে ছাহাবায়ে কেরামের প্রকৃত উত্তরসূরীদের অন্তর্ভুক্ত করুন! যারা আমাদের মাঝ থেকে চির বিদায় হয়ে গেছেন তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতুল ফেরদাউস নছীব করুন! সেই সাথে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১-কে আল্লাহ কবুল করুন- আমীন!!

তাক্বওয়া বা আল্লাহ্ভীতি

আল-কুরআনুল কারীম :

১– وَسارِعُوْا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ – الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ – وَالَّذِيْنَ إِذا فَعَلُوْا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلى ما فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ –

'তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যার পরিধি আসমানসমূহ ও যমীনের সমান, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। আর যারা কোন অশ্লীল কাজ করলে অথবা নিজেদের প্রতি যুলম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর তাদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া কে গুনাহ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করেছে, জেনে শুনে তা তারা বার বার করে না' *(আলে ইমরান ১৩৩-১৩৫)*।

২– وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ–

'আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী' *(আলে ইমরান ১২০)*।

৩– لَتُبْلَوُنَّ فِيْ أَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا أَذىً كَثِيْراً وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ–

'অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাক্বওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ' *(আলে ইমরান ১৮৬)*।

٤– وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ –

'আর তোমরা উত্তম যে কাজ কর, আল্লাহ তা জানেন এবং পাথেয় সংগ্রহ কর। নিশ্চয় উত্তম পাথেয় তাক্বওয়া। তাই হে বিবেক সম্পন্নগণ! তোমরা আমাকে ভয় কর' *(বাক্বারা ১৯৭)*।

৫– قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ فَاتَّقُوا اللهَ يا أُوْلِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ –

'আপনি বলুন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য আপনাকে মুগ্ধ করে। অতএব হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও' *(মায়েদা ১০০)*।

٦– إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُوْنَ–

'নিশ্চয় যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। ফলে তৎক্ষণাৎ তাদের দৃষ্টি খুলে যায়' *(আ'রাফ ২০১)* ।

٧– وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ–

'আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন' *(বাক্বারা ১৯৪)*।

৯– وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ لا يَمَسُّهُمُ السُّوْءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُوْنَ–

'আর আল্লাহ মুত্তাক্বীদেরকে তাদের সাফল্যসহ নাজাত দেবেন। কোন অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না। আর তারা চিন্তিতও হবে না' *(যুমার ৬১)*।

১০– وَالَّذِيْ جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ–

'আর যে সত্য নিয়ে এসেছে এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হল মুত্তাকী' *(যুমার ৩৩)*।

১১– يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِما تَعْمَلُوْنَ–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত' *(হাশর ১৮)*।

১২– يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوْتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ–

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ভয় করার মত। আর তোমরা মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না' *(আলে ইমরান ১০২)*।

১৩– وَتَعاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ–

'তোমরা পরস্পরকে সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। আর মন্দকর্ম ও সীমালঙ্ঘনে পরস্পরের সহযোগিতা করো না। আর আল্লাহ্কে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ আযাব প্রদানে কঠোর' *(মায়েদা ২)*।

١٤– وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى–

'আর শুভ পরিণাম তো মুত্তাক্বীদের জন্য' *(ত্বহা ১৩২)*।

١٥– فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ–

'অতএব তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

١٦– يا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ–

'হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান (হক্ব-বাতিলের পার্থক্যকারী জ্ঞান) প্রদান করবেন, তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ২৯)*।

١٧– إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ–

'তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*।

হাদীছে নববী থেকে :

১৮–عن سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيْعُوْا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوْا جَنَّةَ رَبِّكُمْ–

রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জের দিন খুৎবার দিতে গিয়ে বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় কর, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন কর, তোমাদের মাল-সম্পদের যাকাত প্রদান কর এবং তোমাদের নেতাদের আনুগত্য কর এবং তোমাদের প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ কর' *(তিরমিযী, হা/৬১০, সনদ ছহীহ)*।

১৯–عن أبي سعيد الخدريّ– رضي الله عنه– قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : أُوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الْإِسْلَامِ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ رَوْحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ-

রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে উপদেশস্বরূপ বলেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি, কেননা তা হল সবকিছুর মূল। তোমার উপর জিহাদ আবশ্যক। আর সেটাই হল ইসলামের বৈরাগ্যবাদ। তোমার জন্য আরো আবশ্যক আল্লাহর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত। কেননা তা হল আসমানে প্রশান্তি ও দুনিয়াতে সম্মানের কারণ' *(আহমাদ হা/১১৭৯১, সনদ ছহীহ)*।

২০– عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বংশমর্যাদা মালের কারণে অর্জিত হয় আর সম্মান অর্জিত হয় তাক্বওয়ার কারণে' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯০১, সনদ ছহীহ)*।

২১– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضي الله عنه – قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اَللهِ – صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ اَلْجَنَّةَ تَقْوَى اَللهِ وَحُسْنُ اَلْخُلُقِ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে দুটি কারণে মানুষ সর্বাধিক জান্নাতে প্রবেশ করবে। তা হল আল্লাহভীতি ও সুন্দর চরিত্র' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/ ৪৮৩২, সনদ হাসান)*।

২২– عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاعْمَلْ حَسَنَةً تَمْحُهَا–

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন কর। আর যখনই কোন পাপকর্ম করে ফেল, তখনই কোন সৎকর্ম কর যাতে পাপটি মিটে যায়' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩, সনদ হাসান)*।

২৩– عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ أَلاَ لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ ، وَلاَ لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، وَلاَ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، إِلاَّ بِالتَّقْوَى-

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! আরবের উপর অনারবের কোন প্রাধান্য নেই, অনারবের উপর আরবের কোন প্রাধান্য নেই, কালোর উপর লালের কোন প্রাধান্য নেই, লালের উপর কালোর কোন প্রাধান্য নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত' *(আহমাদ, হা/২২৩৯১)*।

২৪– عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ –صلى الله عليه وسلم– لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ الْبَأْسُ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের কাতারে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ না সে ক্ষতিকারক নয় এমন বিষয় পরিত্যাগ করে কেবল ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৪০৩)*।

২৫– عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اتَّقِ اللَّهَ فِيْنَا فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا -

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ সকাল করে তখন তার অঙ্গসমূহ তার জিহ্বাকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমাদের ভাগ্য তোমার সাথে জড়িত। যদি তুমি সঠিক পথে থাক তবে আমরাও সঠিক পথে থাকব, আর যদি তুমি বক্রপথ অবলম্বন কর তবে আমরাও বক্রপথে চলব' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৮৩৮, সনদ হাসান)*।

২৬– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ-

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে দেখেন না, তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরসমূহ এবং আমলসমূহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩১৪)*।

বিদ্বানদের কথা :

১. উমর (রাঃ) একদিন উবাই বিন কা'বকে বলেন, তুমি কি কখনও কাঁটাপূর্ণ দুর্গম রাস্তায় চলেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ! উমার (রাঃ) বললেন, সেখানে তুমি কি কর? উবাই (রাঃ) বললেন, আমি আমার কাপড় জড়িয়ে নেই এবং অত্যন্ত সাবধানতার সাথে চলি। উমার (রাঃ) বললেন, ওটাই হল তাক্বওয়া *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/১৬৪)*। অনুরূপ বর্ণনা আবু হরায়রা (রাঃ) থেকে এসেছে *(আদ-দুর্রুল মানছূর ১/৬১ পৃঃ)*।

২. মালেক বিন আনাস (রাঃ) বলেন, জনৈক ফকীহ আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ)-কে চিঠি লিখেছিলেন এ মর্মে যে, 'তাক্বওয়াশীল ব্যক্তিদের কিছু চিহ্ন রয়েছে যা দেখলে তাদেরকে চেনা যায় এবং তারাও সেসব গুণাবলীতে নিজেদের পরিচিত করে। যেমন, তারা তাক্বদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকে, বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ্র নেয়ামতসমূহের প্রতি শুকরিয়া আদায় করে, কথায় সত্যবাদী হয়, অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং কুরআনের বিধি-বিধানকে অনুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করে। আর নেতা হলেন বাজারের মত। যেখানে যদি তিনি হক্বপন্থী হন তবে হক্বপন্থীরা তার প্রতি তাদের হক্বসমূহ আদায় করে, আর যদি তিনি বাতিলপন্থী হন, তবে বাতিলপন্থীরা তার প্রতি তাদের হক্বসমূহ আদায় করে' *(মুওয়াত্ত্বা, ইবনুল আছীর, জামেউল উছূল হা/৯৩৫৮)*।

৩. উমর বিন আব্দুল আযীয (র.) বলেন যে, মুত্তাকী ব্যক্তি লাগাম পরিহিত প্রাণীর মত, সে যা ইচ্ছা তাই করে না *(ইমাম বাগাভী, শারহুস সুন্নাহ, পৃঃ ১৪/৩৪১)*।

৪. ত্বালাক বিন হাবীব (র.) বলেন, তাক্বওয়া হল আল্লাহ্র নূরে বিকশিত হয়ে, আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্যশীল হয়ে এবং তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হয়ে আল্লাহ্র নির্দেশসমূহ পালন করা। অপরদিকে আল্লাহ্র নূরে বিকশিত হয়ে, তাঁর শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে যাবতীয় আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার নাম *(ইবনে আবীদ্দুনিয়া, কিতাবুল ইখওয়ান, পৃঃ ১১৫)*।

সারবস্তু :

১. চূড়ান্ত সফলতা নির্ধারিত রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যই।

২. মুত্তাকী ব্যক্তি যেন দুনিয়াতেই আল্লাহ্র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৩. মুত্তাকীদের জন্য দুনিয়াবী জীবন অত্যন্ত সহজসাধ্য। আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে তারা ভয়-ভীতি ও ক্ষণস্থায়ী চাওয়া-পাওয়ার তাড়না থেকে মুক্ত।

৪. মুত্তাকীদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও পাপমুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৫. আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় মুত্তাকীদের জন্যই।

৬. আল্লাহ্র কাছে সর্বাধিক সম্মানী ব্যক্তি হলেন মুত্তাকীরা।

সর্বোপরি আল্লাহ্র ভালবাসা ও নৈকট্য এবং ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত।

নেতৃত্বের পরিচয় ও প্রকৃত গুণাবলী

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম

ভূমিকা : নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ। যোগ্য নেতৃত্বের ফলে একটি সংগঠন দ্রুত উন্নতির উচ্চতর শিখরে আরোহন করতে পারে। আবার নেতৃত্বের দুর্বলতা বা অযোগ্য নেতৃত্বের ফলে সংগঠন ধ্বংস হতে বাধ্য। ফলে প্রকৃত ও যোগ্য নেতৃত্ব জাতীয় জীবনে একান্ত অপরিহার্য। প্রকৃতপক্ষে সঠিক গুণাবলীসম্পন্ন নেতাই পারে একটি সংগঠন তথা দেশ সঠিকভাবে পরিচালিত করতে। এখন প্রশ্ন–নেতৃত্ব কি ও প্রকৃত নেতৃত্বের গুণাবলী কি?

নেতৃত্বের পরিচয় : নেতৃত্ব তাই যা একটি সংগঠন বা দলের লক্ষ্য অর্জনের পন্থা ও মাধ্যম। মানুষবিহীন নির্জন দ্বীপে নেতৃত্ব প্রয়োজন হয় না। যেমন নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর নেতৃত্ব দরকার নেই। আমাদের জীবনে নেতৃত্বর ভূমিকা অনন্য। বিভিন্ন মনীষী নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এলডিন ডব্লিউ গুল্ডনার (Alvin w. Gouldner) নিম্নে লিখিতভাবে নেতৃত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন: 'নেতৃত্ব হইল ব্যক্তি বা দলের সেই নৈতিক গুণাবলী যাহা অন্যদের অনুপ্রেরণা দিয়া বিশেষ দিকে ধাবিত করে' *(ডঃ ইমাজউদ্দিন আহমদ, পৌরবিজ্ঞানের কথা, পৃঃ ২৯৩)*। প্রতিদিন আমাদের জীবনে নেতৃত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খেলার মাঠে দলপতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যদি দলকে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হন, তাহলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব অপরিহার্য। নেতৃত্ব দুর্বল হলে পরাজয় নিশ্চিত হতে বাধ্য। নেতৃত্ব একটি বিশেষ গুণ। এ গুণে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হয়। লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে যখন কর্মীরা নেতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হবে। তাই নেতৃত্ব বলতে আমরা কোন ব্যক্তির সেই আচরণকে বুঝি যা কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে। এখন আমরা নেতার গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রকৃত নেতার গুণাবলী : প্রকৃত নেতাকে অনেক গুণে বিভূষিত হতে হবে। এখানে তার কয়েকটি গুণাবলী আলোচনা করা হ'ল।

(১) গভীর জ্ঞান : নেতৃত্ব দিতে হলে নেতাকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। ইসলামেও সর্বপ্রথম জ্ঞান অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥) অর্থ ঃ 'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আলাক থেকে। পড় তোমার প্রভু মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না *(আলাক ১-৫)*। নেতা যদি ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী হয়। তবে তাঁর পরিচালিত কর্মীরা সঠিক পথের পথিক হতে পারবে। আর যদি তিনি জ্ঞানে অপরিপক্ক হন তবে তিনি তাঁর কর্মীদের ভুল পথে পরিচালিত করবেন। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় যিনি প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই মহান আল্লাহ পাকের উপদেশ হুবহু গ্রহণে তৎপর থাকেন। আর তিনি লোকদের আল্লাহ পাকের পথে পরিচালিত করেন ও উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন। মহান আল্লাহ পাক বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ 'বল ! যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৯)*।

(২) দূরদৃষ্টি : নেতৃত্ব দানের এটি একটি অনন্য গুণ। নেতাকে অবশ্যই তার দূরদৃষ্টি দিয়ে কর্মীদের সঠিক পথে চালানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। এ গুণে বিভূষিত হবার জন্য তাঁকে সচেষ্ট হতে হবে। আল-কুরআনও এ প্রসঙ্গে উদাত্ত আহ্বান জানায়। আল্লাহ পাক বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 'আপনি হিকমতের মাধ্যমে আপনার প্রভুর রাস্তায় দাওয়াত প্রদান করুন' *(নাহাল ১২৫)*। 'হিকমত' বলতে জ্ঞান, দূরদর্শিতা ইত্যাদি বুঝায়। যেখান থেকে حكيم 'হাকীম' অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি, যিনি অন্যায় কথা বা কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন। প্রকৃতপক্ষে নেতা তাঁর দূরদৃষ্টির মাধ্যমে লোকদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন।

(৩) ধৈর্যশীল হওয়া : الصبر 'ছবর' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ ধৈর্য ধারণ করা, বিরত থাকা, আত্মসংযমী হওয়া, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থে মানুষের প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে রোধ করতে ও সংযম রাখতে চেষ্টা করা। ধৈর্য নেতার একটি বিশেষ গুণ। ধৈর্যশীল নেতৃত্বই পারে সাংগঠনিক শৃংখলা রক্ষা করতে। যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট হাসি মুখে বরণ করা ও যে কোন সমস্যায় ধৈর্য ধারণ করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসংঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وتواصوا بالصبر 'আর যারা পরস্পরকে ধৈর্যধারণ করার উপদেশ দিয়েছে, তারা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আছর ৩)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ (٤٥) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 'তোমরা ছবর ও ছালাত-এর মাধ্যমে (আল্লাহ্র কাছে) সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে এটা অবশ্যই কঠিন কাজ কিন্তু সে সম্বন্ধে বিনয়ী লোকেরা ব্যতীত। যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে যে, তারা তাদের প্রভুর সম্মুখীন হবে আর তারা তাঁর নিকটে ফিরে যাবে' *(বাকারা ৪৬-৪৭)*। ধৈর্যধারণ করা কঠিন কাজে হলেও প্রকৃত ঈমানদারদের জন্য তেমন কঠিন নয়। লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়েছেন, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 'হে আমার বৎস! ছালাত কায়েম কর, সৎ কাজের আদেশ দাও আর অন্যায় কাজে নিষেধ কর, আর তোমার প্রতি মুছীবত নেমে আসলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয় ইহা সাহসিকতাপূর্ণ কাজের অন্তর্গত' *(লুকমান ১৭)*। প্রকৃত ধৈর্যশীল নেতাই পারে কর্মীদের মন জয় করতে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে। আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অগণিত পুরস্কারে ভূষিত করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 'যারা ছবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত' *(যুমার ১০)*। তিনি আরও বলেন, أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ

السَّيِّئَةَ 'তাদের ছবরের কারণে তাদেরকে দু'বার পুরস্কৃত করা হবে, তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে' *(কাছাছ ৫৪)*। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ « لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রকৃত বীর পুরুষ সে নয় যে কুস্তিতে অপরকে হারিয়ে দেয়। বরং প্রকৃত বীর পুরুষ হল সেই লোক যে রাগের সময় নিজকে সামলাতে পারে' *(বুখারী)* অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاَءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ 'নিশ্চয়ই বড় বিপদে বড় পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করেন। যে ব্যক্তি সে পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, আর যে ব্যক্তি সে পরীক্ষায় অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি রয়েছে' *(তিরমিযী হা/২৩৯৮, রিয়াযুছ ছালেহীন, 'ছবর' অনুচ্ছেদ ৪১ পৃঃ হা/৪৩)*। সুতরাং নেতাকে নেতৃত্ব দানের সময় যে কোন কষ্ট, মুছীবতে ধৈর্যধারণ করতে হবে। শত বিপদ-আপদের মুখেও নেতাকে যেমন অসীম ধৈর্যধারণ করতে হবে, তেমনি কর্মীদের বিভিন্ন সমস্যারও সমাধান করতে হবে। নেতৃত্বের সঠিক নির্দেশনার মাধ্যমেই আসবে কাঙ্খিত বিজয়। তাই দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় চরম ধৈর্যের গুণ অর্জন করতে হবে। ধৈর্যের অসীম গুণে গুণান্বিত ছিলেন নবী ও রাসূলেরা তাঁরা যে কোন বিপদে মুছীবতে ধৈর্যধারণ করতেন। শত যুলুম নির্যাতনেও তাঁরা বিচলিত হতেন না। তাঁরা সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতেন। আল্লাহ্ পাকও তাঁদেরকে পরীক্ষার পর রহমতের বারিধারা বর্ষণ করতেন। ফলশ্রুতিতে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত নিয়ামত, করুণা আর পরকালে মহা পুরস্কার জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব হবে, ইনশাআল্লাহ।

(৪) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা : এটি এমন একটি আবশ্যকীয় গুণ যার মাধ্যমে নেতা কর্মীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। অনেক সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরী করে ফেললে বিশাল ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যেমন পলাশী যুদ্ধে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পেরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তাহলে হয়তো ইতিহাস অন্য দিকে মোড় নিত। আবার অনেক সময় সামনে এগিয়ে যেয়েও পিছনে সরে আসতে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনী বহুবার পিছনে এসেও শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছিল। মোট কথা বিশেষ পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেতৃত্বের একটি মৌলিক গুণ। এ প্রসঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করা যায়। একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ মুহূর্তের ভিতর শীতল হল কয়েকটি শর্ত মেনে নেওয়ার মধ্য দিয়ে। এক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ)-এর দূরদর্শিতা ও সময়োচিত পদক্ষেপের কারণেই সেটি সম্ভব হয়েছিল। এমনকি এটাকে আল্লাহ্‌পাক বিজয় হিসেবেই ঘোষণা করলেন– إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا 'নিশ্চয় আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি' *(ফাতহ ১)*।

(৫) ন্যায়নীতি : এটি নেতার জন্য একটি অপরিহার্য গুণাবলী। ন্যায়নীতি ব্যতীত অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। সবার প্রতি একই রকম আচরণ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌পাক বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 'বস্তুত: আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন যে, আমানত সমূহ ওর প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দাও। আর তোমরা যখন লোকদের মধ্যে মীমাংসা করবে তখন সেটা ন্যায় বিচারের সাথে সম্পন্ন করবে' *(নিসা ৫৮)*।

(৬) ভাষা দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা : মনের ভাব সঠিকভাবে বুঝানোর জন্য ভাষার দৃঢ়তা ও স্বচ্ছতা একান্ত প্রয়োজন। স্পষ্ট ভাষা ও নরম কথা মানুষকে আকৃষ্ট করে। এই মর্মে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মুসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)-কে উপদেশ দিয়েছিলেন– فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا 'তোমরা (মূসা ও হারুন) উভয়ে তার (ফিরআউনের) সঙ্গে নরম সুরে কথা বল' *(ত্বাহা ৪৪)*। মানুষের কথা সবাইকে আকৃষ্ট করে, আবার কথার কাঠিন্যতা বা কঠোরতা মানুষকে দূরে ঠেলে দিতে পারে। আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর কথায় বিধর্মীরা আকৃষ্ট হত। আর এ কারণে দলে দলে লোক ইসলামে দাখিল হতেন। স্বয়ং মহান আল্লাহ পাক নবী (ছাঃ)-এর শানে বলেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

'(হে নবী!) এটা আল্লাহ্‌র বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের! অন্যথায় আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তবে এসব লোক আপনার চারদিক থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। প্রকৃতপক্ষে নেতাকে কথা বলার সময় ভাষায় দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা, সরলতা ও আকর্ষণীয় হতে হবে। তবেই তাঁর ভিতর একটি আবশ্যকীয় গুণ অর্জিত হবে। আর তখনই তিনি হবেন একজন আর্দশ নেতা।

(৭) আত্মবিশ্বাস : আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবলই পারে একটি আদর্শকে মঞ্জিলে মাকছুদে পৌঁছে দিতে। আদর্শ যত সঠিক ও মজবুত হৌক না কেন তার নেতৃত্ব যদি দুর্বল হয় এবং আত্মবিশ্বাসে গণ্ডগোল থাকে, তাহলে সেটা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তদ্রূপ নেতার আত্মবিশ্বাস দুর্বল হলে কর্মীদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। এজন্য নেতাকে দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হতে হবে। এ গুণে নেতাকে অবশ্যই বিভূষিত হতে হবে। মহানবী (ছাঃ)-এর আত্মবিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর নির্ভরতার কারণে বদরের যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ (তিনশত তের) ছাহাবী ১০০০ (এক হাজার)-এরও অধিক কাফেরদের মোকাবেলা করে বিজয়ী হয়েছিলেন।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনায় আমরা সম্যক অবগত হয়েছি যে, নেতৃত্ব কি? ও প্রকৃত নেতার গুণাবলী কি কি হতে পারে? এছাড়া আরও নেতাকে অনেক গুণে গুণান্বিত হওয়া অবশ্যক। তিনি হবেন সর্ব গুণের আধার। তাঁর গুণে সমাজ হবে আলোকিত, রাষ্ট্র পাবে অমানিশার অন্ধকারে প্রস্ফূটিত আলোকরশ্মি। সেই আলোয় জগদ্বাসী চলবে সঠিক পথে। নেতাকে তাই হতে হবে model সেই model বা আদর্শ চরিত্রে চিত্রায়িত ছিলেন আমাদের মহানবী (ছাঃ)। আর এজন্য তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও একই চরিত্রে গড়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন পরশপাথর। আর এর সংস্পর্শে সবাই খাঁটি হয়ে গিয়েছিল। আমাদেরও এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত হয়ে প্রকৃতভাবে গড়ে উঠতে হবে। তাহলেই ইহ্কাল ও পরকালে ধন্য হয়ে গড়ে উঠা সম্ভবপর হবে। কবির ভাষায়– 'এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরিলেও হাসিবে তুমি কাঁদিবে ভুবন'।

লেখক : সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

আত্মসমালোচনা

আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

নিন্দাসূচক সমালোচনা করা আমাদের এমন একটি নিয়মিত অভ্যাস যা থেকে বেঁচে থাকতে পারেন এমন ব্যক্তির সংখ্যা সমাজে খুবই কম। মজার ব্যাপার যে, এই আমাদেরই একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি নিজের সমালোচনা শুনতে আগ্রহী। অথচ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আমরা প্রতিনিয়তই অন্যের সমালোচনা করি, আবার নিজেরাও একইভাবে অন্যের সমালোচনার শিকার হই। প্রাত্যহিক জীবনে সামান্য অবসর পেলেই আমরা তা অন্যের সমালোচনা বা নিন্দায় অতিবাহিত করার সুযোগ হাতছাড়া করি না। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনের সূরা হুজুরাতের ১২ নং আয়াতে যে কোন গীবত তথা নিন্দাবাচক সমালোচনা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيْمٌ. ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিক ধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতিপয় ধারণা গুনাহ এবং তোমরা গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভ্রাতার গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা কবুলকারী ও পরম দয়ালু’ *(হুজুরাত ১২)*।

আভিধানিক অর্থে সমালোচনা শব্দটির মূল অর্থ সম্যক আলোচনা বা বিস্তারিত আলোচনা। প্রায়োগিকভাবে এর দু’টি অর্থ হয়ে থাকে– একটি নিন্দাসূচক। অপরটি সংশোধনসূচক। নিন্দাসূচক সমালোচনা বলতে বুঝায় গীবত, তোহমত বা অনুরূপ বিষয়সমূহ, যা আমরা সাধারণভাবে করে থাকি। আর সংশোধনসূচক সমালোচনা হল শাসক ও প্রশাসনযন্ত্রের সংস্কার কামনায় যে সমালোচনা করা হয়। আল্লাহ্র দ্বীনের সুরক্ষার স্বার্থে যে সমালোচনা করা হয় তাও এই পর্যায়ভুক্ত– যেমন ওলামায়ে কেরাম হাদীছের রাবীদের পরিচয় নির্ণয়ে যে সমালোচনা শাস্ত্র (জারাহ-তা’দীল) উদ্ভাবন করেছেন।

অত্র নিবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রচলিত সমালোচনা নয়, বরং তারই নিকটস্থ সমজাতীয় অথচ বিপরীত বিষয়– আত্মসমালোচনা। যার অর্থ নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সমালোচনা করা। অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করে তা সংশোধনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত থেকে উন্নততর স্তরের নিয়ে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া তার নামই হল আত্মসমালোচনা। অন্যের সমালোচনা করা কাজটা যত সহজ, নিজের সমালোচনা করা কিন্তু ততটা সহজ নয়। কেননা ‘আমি অমুক ব্যক্তির চেয়ে শ্রেয়তর’–এমন ধারণাই যখন অন্যের সমালোচনায় প্রলুব্ধ করে, তখন সেখানে নিজের সমালোচনার সুযোগ থাকে কোথায়? স্বীয় অবস্থানকে এভাবে সমালোচনার উর্ধ্বে রেখে অন্যের সমালোচনা করার ফলে এক প্রকার আত্মতুষ্টি আমাদের পূর্বাহ্নেই গ্রাস করে রাখে। ফলে আমাদের পক্ষে নিজেদের ত্রুটি ও সমস্যাগুলো ধরার যেমন সুযোগ থাকে না, তেমন থাকে না তা সংশোধনের জন্যও কোনরূপ সুযোগ। এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই অত্র নিবন্ধে আমরা অনুধাবন করতে চেয়েছি কেন মানুষের সমালোচনার পরিবর্তে নিজের সমালোচনার দৃষ্টিকোণটাই আমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কীভাবে তা ব্যক্তি ও সমাজের সার্বিক সংশোধনে উন্নততর ও অধিক কার্যকর পদ্ধতি।

শাব্দিক অর্থ :

আভিধানিক অর্থে আত্মসমালোচনা বলতে বুঝায় নিজের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা। আর আরবীতে বলা হয়– **محاسبة النفس** অর্থাৎ স্বীয় আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। বিখ্যাত আরবী অভিধান ‘লিসানুল আরাবে’ উল্লেখিত হয়েছে– **وهو مأخوذ من مادّة (ح س ب) الّتي تدلّ على العـــدّ، تقول: حسبت الشّي ء أحسبه حسبا وحسبانا، وحسابا وحسابة إذا عددته،** অর্থাৎ মুহাসাবার শাব্দিক অর্থ হল- গণনা করা বা হিসাব করা। সুতরাং মুহাসাবাতুন নাফসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে আত্মার হিসাব গ্রহণ করা। ইংরেজীতে একে বলা হয়, self-criticism বা self-accountability অর্থাৎ আত্মসমালোচনা বা আত্মসমীক্ষা।

পারিভাষিক অর্থ :

পারিভাষিক অর্থে আত্মসমালোচনা বলতে বুঝায়, কোন কাজ করা বা ছাড়ার পূর্বে এমনভাবে সচেতন থাকা, যেন আমি কী করতে যাচ্ছি বা কী ছাড়তে যাচ্ছি তা আমার কাছে স্পষ্ট থাকে। যদি তা দেখা যায় আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক, তবে তা নিষ্ঠার সাথে পালন করা। আর যদি তা হয় আল্লাহ্র অসন্তুষ্টিমূলক তবে তা থেকে সর্বতোভাবে বিরত থাকা। সাথে সাথে নিজেকে সর্বদা আল্লাহ্র সন্তুষ্টিমূলক কাজ তথা ফরয ও নফল ইবাদতে আবদ্ধ রাখা।

ইমাম মাওয়ার্দী বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হল প্রতিদিন রাতে শয়নের পূর্বে দিনের বেলা যে সমস্ত কাজ নিজের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে সেসব কাজ তদন্ত করা। অতঃপর যে কাজটি উত্তম ও কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়, তা আগামীতে অব্যাহত রাখা এবং অনুরূপ কাজে নিজেকে জড়িত রাখা। আর যে সব কাজ নিজের ও সমাজের জন্য মন্দ ও অকল্যাণকর প্রমাণিত হয়, সে কাজটি পরিত্যাগ করা এবং সাধ্যমত তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর আগামীতেও অনুরূপ কাজে জড়িত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখা *(আদাবুদ দ্বীন ওয়াদ দুনিয়া, পৃঃ ৩৪৬)*।

আল্লামা ইবনুল কাইয়েমের মন্তব্য এখানে আরো স্পষ্ট। তিনি বলেন, আত্মসমালোচনার অর্থ হচ্ছে- নিজের জন্য কী করণীয় এবং কী বর্জনীয় তা পৃথক করে ফেলা। অতঃপর সর্বদা ফরয ও নফল কতর্ব্যসমূহ আদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করার উপর সুদৃঢ় থাকা। আত্মসমালোচনার অপর সংজ্ঞায় তিনি বলেন, এর অর্থ হল প্রতিটি কাজে সর্বপ্রথম আল্লাহ্র হক্বসমূহের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া; অতঃপর সে হক্বগুলো যথাযথভাবে আদায় করা হচ্ছে কী না তার প্রতি কড়া নজর রাখা *(আল ফাওয়ায়েদ)*।

আত্মসমালোচনার হুকুম :

‘মুহাসাবাতুন নাফস’ বা আত্মসমালোচনাকে প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য ঘোষণা করে আল্লাহ সূরা হাশরের ১৮ নং আয়াতে বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٨) وَلاَ تَكُونُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য উচিৎ- আগামী কালের জন্য (অর্থাৎ আখিরাতের জন্য) সে কি প্রেরণ করেছে, তা চিন্তা করা। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মভোলা করে দিয়েছেন (অর্থাৎ তারা কোন কাজটি ভাল, কোনটি মন্দ তা বাছাই করা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে)। নিশ্চয়ই তারা ফাসিক *(হাশর ১৮)*। ইবনুল কাইয়িম বলেন, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রত্যেক মুমিনের জন্য আত্মসমালোচনাকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন। যেন আল্লাহ বলছেন, তোমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করা কর্তব্য যে, আগামী দিনের জন্য তুমি যা প্রেরণ করেছ তা তোমার জান্নাতের পথ সুগম করছে, না কি তোমাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে? *(মাদারিজুস সালেকীন, ১/১৭০ পৃঃ)*।

রাসূল (ছাঃ)-এর বহু হাদীছ থেকে আত্মসমালোচনার গুরুত্ব স্পষ্ট বোঝা যায়। উমার (রাঃ) বলেন, حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فإنّه أهون عليكم في الحساب غدا، أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزيّنوا للعرض الأكبر يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفى مِنْكُمْ خافِيَةٌ 'তোমরা নিজেদের আমলনামার হিসাব নিজেরাই গ্রহণ কর, চূড়ান্ত হিসাব দিবসে তোমাদের কাছ থেকে হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই। আর তোমরা তোমাদের আমলনামা মেপে নাও চূড়ান্ত দিনে মাপ গৃহীত হওয়ার পূর্বেই। কেননা আজকের দিনে নিজের হিসাব নিজেই গ্রহণ করতে পারলে আগামীদিনের চূড়ান্ত মুহূর্তে তা তোমাদের জন্য হালকা হয়ে যাবে। তাই সেই মহাপ্রদর্শনীর দিনের জন্য তোমরা নিজেদেরকে সুসজ্জিত করে নাও, যেদিন তোমরা (তোমাদের আমলসহ) উপস্থিত হবে এবং তোমাদের কিছুই সেদিন গোপন থাকবে না'। অনুরূপভাবে ইমাম শাফেঈ বলেন, أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه ، وأنار قبره قبل أن يسكنه ، وأرضى ربه قبل أن يلقاه وصلى الجماعة قبل أن تصلي عليه الجماعة ، وحاسب نفسه قبل أن تحاسبه 'সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সে-ই যে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে দুনিয়া তাকে পরিত্যাগ করার পূর্বেই, কবরকে আলোকিত করে কবরে বসবাস করার পূর্বেই, স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎলাভের পূর্বেই, জামা'আতে ছালাত আদায় করে তার উপর জামা'আতে ছালাত (অর্থাৎ জানাযার ছালাত) পঠিত হবার পূর্বেই, নিজের হিসাবে নিজেই গ্রহণ করে হিসাব দিবসে তার হিসাব গৃহীত হবার পূর্বেই'।

আত্মসমালোচনার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

১. দ্বীনের উপর ইস্তিকামাত অর্জন : আত্মসমালোচনা দ্বীনের প্রতি ইস্তিক্বামাত অর্জন করা তথা অটল থাকার সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম, যা মানুষকে আল্লাহ্র দরবারে মুহসিন ও মুখলিছ বান্দাদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। ইমাম গাযালী বলেন, 'মুহাসাবাকারী ব্যক্তির উদাহরণ হল একজন ব্যবসায়ীর মত, যে পরকালীন জীবনের জন্য ব্যবসা করে। এ ব্যবসায় দুনিয়াবী মুনাফা হিসাবে সে পেতে পারে আত্মিক পরিশুদ্ধি আর পরকালীন মুনাফা হিসাবে পেতে পারে জান্নাতুল ফেরদাউস এবং সিদরাতুল মুনতাহায় আম্বিয়ায়ে কেরামসহ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষদের চিরন্তন সাহচর্য। তাই দুনিয়াবী ব্যবসায় সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের চেয়ে পরকালীন ব্যবসার সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ করা বহু বহু গুণ বেশী গুরুত্বপূর্ণ' *(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/৩৯৪ পৃঃ)*।

২. পরকালীন জওয়াবদিহিতা সৃষ্টি : আত্মসমালোচনার সবচেয়ে বড় উপকার হল- এর মাধ্যমে মানুষের মাঝে পরকালীন জওয়াবদিহিতার উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি তার প্রতিটি কর্মে আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করার অনুভূতি রাখে, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র একজন মুখলিছ ও মুত্তাকী বান্দায় পরিণত হয়। উমর (রাঃ) রাত হলে মাটিতে আক্ষেপের সাথে পদাঘাত করে নিজেকে বলতেন, 'বল! আজ তুমি কি করেছ?'। মাইমুন বিন মেহরান বলতেন, 'মুত্তাকী ব্যক্তি সেই যে নিজের জওয়াবদিহিতা এমন কঠোরভাবে গ্রহণ করে যেন সে একজন অত্যাচারী শাসক' *(ইহয়াউ উলূম ৩/৩৯৫)*।

৩. দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি : আত্মসমালোচনা মানুষকে নিজ দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন করে তোলে। ফলে সে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্যসমূহ পালনে বহুগুণ বেশী তৎপর হতে পারে।

৪. তওবার সুযোগ লাভ : আত্মসমালোচনা পাপ থেকে তওবা করার সর্বোত্তম মাধ্যম। যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে জানে সে আল্লাহ্র হক্ব আদায়ে যেসব ত্রুটি করেছে, তা তার সামনে যখনই প্রকাশিত হয় তখনই সে তওবা করার সুযোগ পায়।

৫. ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন : আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের ত্রুটিগুলো ধরা যায়। ফলে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে ভবিষ্যতে আরো উন্নতরূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়। জীবনের প্রতিটি স্তরে আত্মসমালোচনা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা অবলম্বন করার অর্থ স্বীয় ভবিষ্যতকে অর্থপূর্ণ করে তোলা এবং জীবনের উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা। যা তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে বিজয়লাভ অনিবার্য করে তোলে।

৬. নিয়তের পরিশুদ্ধি : আত্মসমালোচনা এমন একটি অভ্যাস যা বান্দা ও আল্লাহ্র মধ্যকার একটি গোপন লেনদেনের মত। ফলে তাতে আত্মার পবিত্রতা ও নিয়তের পরিশুদ্ধি অর্জিত হয় এবং অন্তর শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ইখলাছপূর্ণ হয়ে ওঠে।

৭. জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি : আত্মসমালোচনা জীবনের লক্ষ্যকে সবসময় সজীব করে রাখে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে আমরা অনুভব করতে পারি আমাদেরকে এই পৃথিবীর বুকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। পার্থিব জীবন শুধু খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টার নয়, এ জীবনের পরবর্তী যে অনন্ত এক জীবন, তার জন্য যে আমাদের সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে–আত্মসমালোচনা আমাদেরকে সর্বক্ষণ তা স্মরণ করায়।

৮. আমলনামায় সমৃদ্ধি অর্জন : সারাদিন অনাহারে থেকে ছিয়াম পালন, রাতের ঘুম পরিত্যাগ করে তাহাজ্জুদ আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহ্র পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় ইত্যাদি ফরয ও নফল ইবাদত মুহাসাবার এক একটি মহৎ ফলাফল। ইমাম গাযালী বলেন, 'ফজরের ছালাত আদায়ের পর মানুষের উচিৎ নিজের অন্তরের উপর ব্যবসায়ীদের মত শর্তারোপ করা এবং বলা যে– হে অন্তর! আমার একমাত্র পুঁজি আমার বয়স। বয়স যতই অতিক্রান্ত হচ্ছে ততই আমার পুঁজি নিঃশেষ হয়ে আসছে। আর তার সাথে ফিকে হয়ে আসছে অধিক লাভের আশাও। আজ আরো একটি নতুন দিন, আল্লাহ আমাকে সুযোগ দিয়েছেন আমার ব্যবসায় অধিক উন্নতি সাধনের জন্য। যদি আল্লাহ আজ আমার মৃত্যু দান করেন তবে তাঁর কাছে আমার কামনা থাকবে একটি দিনের জন্য হলেও দুনিয়ায় ফেরৎ যাওয়ার, যেন আমার আমলনামা আরও সমৃদ্ধ করতে পারি। সুতরাং আমার আত্মা! তুমি

আপন হিসাব গ্রহণ কর, কেননা তোমার মৃত্যু হবেই, তারপর হবে পুনরুজ্জীবন। তাই সাবধান! আবারো সাবধান! দিনটি তুমি নষ্ট করো না *(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/৩৯৪ পৃঃ)*।

৯. ছোট ও বড় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়া : মুহাসাবার ফলে কোন পাপ দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তি করতে গেলে বিবেকে বাধা দেয়। ফলে পাপের কাজ থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

১০. দুনিয়াবী জীবনের চাহিদাহ্রাস : মুহাসাবার ফলে তাক্বদীরের প্রতি সুস্থির বিশ্বাস জন্ম নেয়। ফলে দুনিয়াবী যিন্দেগীর দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ আমাদেরকে বেকায়দায় ফেলতে পারে না। কোন অলীক কামনা-বাসনা আমাদের বিচলিত করে না। ফলে দুনিয়াবী ধন-সম্পদ, পদবী-মর্যাদা লাভের জন্য আর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ারও প্রয়োজন অনুভূত হয় না।

আত্মসমালোচনা না করার ফলাফল :

ইবনুল কাইয়িম বলেন, মুহাসাবা পরিত্যাগ করার অর্থ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলা। এতে মানুষের অন্তর পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। অর্থাৎ মুহাসাবা পরিত্যাগ করার ফলে দ্বীনের প্রতি তার শিথিলতা চলে আসে, যা তাকে নিশ্চিতভাবেই দুনিয়াবী জীবন ও পরকালীন জীবনে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। কেবলমাত্র আত্মগর্বী, প্রতারিত আত্মাই মুহাসাবা পরিত্যাগ করতে পারে। ফলশ্রুতিতে সে কোন কিছুর পরিণাম চিন্তা করে না। সমস্ত পাপ তার কাছে অত্যন্ত সহজ বিষয় হয়ে যায়। অবশেষে একসময় পাপ থেকে বেরিয়ে আসাটা তার কাছে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কখনো যদি সে সৎপথের সন্ধান পায়ও, তবুও সে তার অন্যায় অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করে।

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি :

আত্মসমালোচনা করার পদ্ধতি মূলতঃ দুটি-

১. কোন আমল শুরু করার পূর্বে মুহাসাবা করা : অর্থাৎ কোন কাজের সংকল্প করার পূর্বেই সে কাজটি সম্পর্কে অনুসন্ধান করা এবং যতক্ষণ না দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনের জন্য সেটা উত্তম ও কল্যাণকর প্রতীয়মান হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কাজ থেকে বিরত থাকা (ব্যবসা, চাকুরী ইত্যাদি)। প্রতিদিন সকালে অন্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে নিতে হবে যেন সারাদিন সৎ আমলের সাথে সংযুক্ত থেকে অসৎ আমল থেকে বিরত থাকা যায়।

২. আমল শেষ করার পর মুহাসাবা করা : চার ধাপে এটা করা যায়-

ক. আমলের প্রকৃত হক্ব আদায় করা হয়েছে কি না তা লক্ষ্য করা : ইবাদতসমূহ পালিত হওয়ার পর নজর দেয়া যে, তাতে আল্লাহ্র হক্ব পরিপূর্ণ আদায় করা হয়েছে কি না। ইবাদতে আল্লাহ্র হক্ব ছয়টি- ক. আমলের মধ্যে খুলূছিয়াত থাকা, খ. তার মাঝে আল্লাহ্র জন্য নছীহত থাকা (আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রতি সঠিক বিশ্বাস পোষণ করা), গ. রাসূলের (ছাঃ) প্রতি আনুগত্য থাকা, ঘ. একাগ্রতা থাকা, ঙ. নিজ সত্তার উপর আল্লাহ্র কর্তৃত্বের পূর্ণ উপলব্ধি থাকা, চ. অতঃপর এ সকল বিষয়াদির প্রতিটিতে নিজের ত্রুটি হচ্ছে–এই অনুতপ্তভাব থাকা *(ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৩৯৪ পৃঃ)*। এ সকল হক্ব পূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে কি-না আমল সম্পন্ন করার পর তা চিন্তা করতে হবে।

খ. ছওয়াব অর্জনে কমতি হল কি না তা লক্ষ্য করা : অর্থাৎ কোন বিশেষ বড় উপলক্ষ্য যেমন- রামাযানের ছিয়াম, জুম'আর দিন, আশুরা, কিয়ামুল লাইল ইত্যাদি ছওয়াব অর্জনের বড় উপলক্ষ্যগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পর যথাযথভাবে তার হক্ব আদায় করা হল কি-না তা নিয়ে আত্মসমীক্ষায় বসা এবং ভবিষ্যতে আরো উত্তমভাবে তা পালনের জন্য সংকল্প করা।

গ. অপ্রয়োজনীয় কাজ পরিত্যাগ করা : দ্বীনী দৃষ্টিতে যে হালাল কাজ করার চেয়ে না করাই বেশী উত্তম মনে হয়, তা থেকে নিজেকে বিরত রাখা (যেমন-ইসলামী গান অত্যধিক শোনা)। কোন নির্দোষ কিন্তু অগুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকলে তা থেকেও নিজেকে সাধ্যমত সংযত করা। অর্থাৎ আগামীতে কেন এটা করব? এর দ্বারা কি আমি আল্লাহ্র পথে আরো অগ্রসর হতে পেরেছি? এর দ্বারা কি দুনিয়াবী ও পরকালীন জীবনে আমার বা মানবসমাজের কোন লাভ হয়েছে? তা অন্য কোন লাভজনক কাজ থেকে আমাকে বিরত করেনি তো? ইত্যাদি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে সে পথে আর পা না বাড়ানো *(ইহয়াউল উলূম ৪/৩৯৪)*।

ঘ. ক্ষমা প্রার্থনা করা ও সৎআমল করা : এত সতর্কতার পরও যদি কোন পাপ অনিচ্ছাকৃতভাবে হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তওবা করা। সাথে সাথে সৎআমল দ্বারা এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ দেওয়া। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها** 'তুমি যেখানেই থাক আল্লাহকে ভয় কর, কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সাথে সাথে সৎআমল কর যাতে তা মিটে যায়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

আত্মসমালোচনা করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণ :

এক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করতে পারি-

১. পাপ : কবীরা গুনাহ করা অথবা কোন ছগীরা গুনাহের উপর অভ্যস্ত থাকার কারণে মানুষের অন্তরে মরিচা পড়ে যায়। পাপের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় অন্তরের মরিচাও তত বিস্তৃত হয়। ফলে মুহাসাবা তথা আত্মসমালোচনার অনুভূতি মানুষের মন থেকে উঠে যেতে থাকে। একপর্যায়ে এমনকি কোন আমলটি খারাপ আর কোন আমলটি ভাল তা পার্থক্য করার প্রয়োজনীয়তাও সে হারিয়ে ফেলে।

২. দুনিয়াবী ব্যস্ততা : যে হালাল ও মুবাহ কাজ মানুষকে দুনিয়াবী যিন্দেগীতে বেশী ব্যস্ত রাখে এবং পরকালীন জীবনে নজর দেওয়ার সুযোগ কমিয়ে দেয় সেই কাজ তার আত্মসমালোচনার অনুভূতিও কমিয়ে দেয়।

৩. আল্লাহ্র বড়ত্ব ও তার প্রতি আনুগত্যের মাহাত্ম্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়া : যদি আমরা তা যথার্থভাবে বুঝতে পারতাম, তবে অবশ্যই আমাদের প্রতি আল্লাহ্র অপরিসীম নে'মত ও তার বিপরীতে আমাদের চরম অকৃতজ্ঞতার লজ্জাকর অবস্থান তুলনা করতে পারতাম। তুলনা করতে পারতাম– আমাদের প্রতি আল্লাহ্র হক্ব কী কী আর তার কতটুকু আমরা প্রতিপালন করছি এবং আখেরাতের জন্য সঞ্চয় করছি।

৪. নিজের প্রতি সুধারণা রাখা : একজন মুমিনের জন্য এটা এক বড় ধরনের ঘাতক রোগ। কেননা নিজের প্রতি সুধারণা আপন ত্রুটিসমূহ থেকে মানুষকে বেখেয়াল করে দেয় এবং আল্লাহ সম্পর্কে উদাসীন করে তোলে। যদি সে নিজের ত্রুটি ধরতেই না পারে তবে কিভাবে সে তার চিকিৎসা করবে? এজন্য বলা হয়ে থাকে, **إنك أن تبيت نائماً وتصبح نادماً خير من أن تبيت قائماً وتصبح معجباً** 'তুমি সারারাত ঘুমিয়ে যদি অনুতপ্ত অবস্থায় সকাল কর এটাই অধিক ভাল তার থেকে, যদি তুমি সারারাত তাহাজ্জুদ আদায় কর আর আত্মগর্ব নিয়ে সকাল কর।

৫. আখেরাতকে স্মরণ না করা : দুনিয়াবী মাল-সম্পদ আর পদমর্যাদার লোভে আখেরাতের অনন্ত যিন্দেগীকে ভুলে থাকার কারণে মানুষ মুহাসাবার অভ্যাস হারিয়ে ফেলে।

আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত হওয়ার উপায় :

১. তাক্বওয়ার অনুভূতি জাগ্রত করা : আত্মসমালোচনার জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল আল্লাহভীতি অর্জন করা। আল্লাহ্‌র প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, তাঁর মহত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি সর্বময় ক্ষমতার প্রতি ভীতির সাথে অবনত হওয়া পাপপ্রবণ আত্মাকে যেমন প্রশান্ত করে, তেমনি বিবেকের শাসনকে করে প্রবল। তাই জনৈক মনীষী বলেন, 'তোমার পাপকাজটি কত ছোট সে চিন্তা করো না, বরং চিন্তা করো তুমি কত বড় ও কত মহান একজন সত্তার অবাধ্যতা করেছ।'

২. আমলনামার হিসাব প্রদানের অনুভূতি জাগ্রত করা : এই অনুভূতি নিজের মধ্যে জাগ্রত করা যে, যদি আমার আমলনামা দুনিয়াতেই আমি হিসাব করে নেই তবে কিয়ামতের দিন আমার হিসাব প্রদান সহজ হয়ে যাবে; আর যদি আত্মসমালোচনায় অবহেলা করি তার অর্থ হবে- কিয়ামত দিবসের হিসাব কঠিন হয়ে যাওয়া। ইবনুল কাইয়িম বলেন, **اشتر نفسك اليوم فان السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة وسيأتي على تلك السوق والبضايع يوم لا تصل فيها الى قليل ولا كثير ذلك يوم التغابن** 'তোমার আত্মাকে ক্রয় কর আজই, কেননা আজ বাজার সচল, দামও আয়ত্বের মধ্যে, পণ্য-সামগ্রী অনেক সস্তা। অচিরেই এই বাজার ও এই পণ্যসামগ্রীর উপর এমন দিন আসছে যেদিন সেখান থেকে ক্রয়ের আর কোনই সুযোগ পাবে না। কেননা সেদিন হল হালখাতার দিন' (লাভ-ক্ষতি হিসাবের দিন) *(আল-ফাওয়ায়েদ, পৃঃ ৪৯)*।

৩. জান্নাত ও জাহান্নামকে স্মরণ : মুহাসাবা করার অর্থ জান্নাতপ্রাপ্তি এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্যলাভের সৌভাগ্য অর্জন আর মুহাসাবা না করার অর্থ জাহান্নামের রাস্তায় ধাবমান হওয়া এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য থেকে বঞ্চিত হওয়া– এই উপলব্ধি অন্তরের গভীরে বদ্ধমূল করে রাখতে হবে। আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ) বলতেন, **إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.** 'তুমি যখন সন্ধ্যা করবে তখন সকাল করার আশা করো না এবং যখন তুমি সকাল করবে তখন সন্ধা করার আশা করো না। অতএব অসুস্থতার পূর্বে তুমি তোমার সুস্থতার সুযোগ গ্রহণ কর এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই জীবনটাকে সুযোগ হিসাবে নাও' *(বুখারী)*।

৪. আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবনী অধ্যয়ন করা : আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সালাফে ছালেহীন মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁদের মহত্তম জীবনাদর্শ আমাদেরকে সবসময় চেতনাদীপ্ত করে তোলে। তাঁরাই আমাদের চেতনার বাতিঘর। তাই তাঁদের জীবনেতিহাস জানতে হবে এবং তাদের জীবনাদর্শকে আমাদের জন্য একমাত্র আদর্শ মনে করতে হবে। আর এর মাধ্যমেই নিজেকে ক্রমাগত উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় আমরা মুহাসাবায় অভ্যস্ত হতে পারি। তাছাড়া মুহাসাবাকারী ব্যক্তির সাহচর্যে থাকাও মুহাসাবা করার জন্য খুব সহায়ক।

৫. আত্মা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা : অর্থাৎ নফসের গতি-প্রকৃতি, নফসের পাতানো ফাঁদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। নফস যে সামান্য সুযোগ পেলেই অকল্যাণ ও অনৈতিক কাজে প্ররোচিত করে তা যদি আমরা উপলব্ধি করতে পারি তবে নফসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য মানসিক শক্তি তৈরী হয়।

৬. দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন : শরী'আতের বিধি-বিধান তথা হক্ব-বাতিল, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা।

৭. নিজ সম্পর্কে সুধারণা পরিত্যাগ করা : এ ভয়াবহ রোগটির বিষময় ফলাফল এমনই যে, নিজের ভাল কাজকেই খারাপ আর খারাপ কাজকেই ভাল মনে হতে শুরু করে। এজন্য ইবনুল কাইয়িম বলেন, **ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه** 'নিজের প্রতি যে ব্যক্তি সুধারণা রাখে মূলতঃ সে নিজ সম্পর্কে অজ্ঞতম ব্যক্তি'। তাই নিজেকে সঠিক ও উঁচুস্তরের লোক মনে করে আত্মতৃপ্তি বোধ করা যাবে না। নতুবা নিজেকে অগ্রগামী করার তো সুযোগ থাকবেই না, বরং অচিরেই অনিবার্য ব্যর্থতার মুখোমখি হতে হবে।

৮. নিজের আমলনামা পরিমাপ করা : নিজের সৎআমল ও অসৎআমলকে ছওয়াব ও পাপের মাপকাঠিতে পরিমাপ করা এবং কোনটির ওযন ও প্রকৃতি কেমন তা যাচাই করা। এর ফলে মুহাসাবার অনুভূতি বিশেষভাবে জাগ্রত হবে। সবসময় মনে রাখতে হবে হাশরের ময়দানে আমাদের কৃত অণু পরিমাণ পুণ্য এবং অণু পরিমাণ পাপও আমাদের আমলনামায় প্রদর্শিত হতে যাচ্ছে *(যিলযাল ৭-৮)*।

শেষকথা :

পরিশেষে বলব, আত্মসমালোচনা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি করে, তেমনি এটি পরকালীন জওয়াবদিহিতা সৃষ্টির সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম। আত্মসমালোচনা আমাদের বিবেককে শানিত করে তোলে। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে প্রখর ও প্রজ্ঞাবান করে তুলে। করণীয় কাজ কিভাবে করব, বর্জনীয় কাজ কিভাবে বর্জন করব তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। সর্বোপরি জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে একজন প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠার কাজে সর্বদা প্রহরীর মত দায়িত্ব পালন করে। প্রকৃতঅর্থে নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার জন্য যে ব্যক্তি সর্বদা সংগ্রাম চালায় সে ব্যক্তিই প্রকৃত মুজাহিদ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **المجاهد من جاهد نفسه في الله** 'মুজাহিদ সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্‌র জন্য নিজের অন্তরের সাথে জিহাদে লিপ্ত থাকে' *(ছহীহুল জামে' হা/৬৬৭৯)*।

আত্মসমালোচনা আমাদের আরো শিক্ষা দেয়, অন্যের ত্রুটি ধরার পূর্বে নিজের ত্রুটি দেখো। অন্যের নিন্দা করার পূর্বে নিজের মধ্যে যা কিছু খারাপ তা দূর করে নাও। এই নীতি যদি আমরা অবলম্বন করতে পারি তবে আমরা নিজ থেকেই নিজেদেরকে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা চালাতে পারব, তেমনি অন্যের মাঝে ভুল দেখতে পেলে, নিজের ভুলের মত মনে করে তা ভালবাসা ও স্নেহের সাথে সংশোধনের চেষ্টা নিতে পারব। এভাবে সমাজ পরিণত হবে পারস্পরিক সহযোগিতা, ভালাবাসা ও সৌহার্দ্যে পূর্ণ এক স্বর্গীয় সমাজ।

অতএব আসুন! আমরা নিজেদেরকে একজন প্রকৃত মানুষ হিসাবে, প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্কতার সাথে ফেলি। নিজেকে সচ্চরিত্রবান, নীতিবান ও আদর্শবান করে তুলি। এর মাধ্যমে সমাজের আরো দশটা লোক আমাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে। আর এভাবেই গড়ে উঠবে আদর্শ পরিবার, আদর্শ সমাজ থেকে আদর্শ রাষ্ট্র। আল্লাহ আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন এবং ইহজাগতিক, পারলৌকিক সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখার যোগ্যতা ও সামর্থ্য দান করুন। আমীন!!

সবসময় মনে রাখুন রাসূল (ছাঃ)-এর সেই অবিস্মরণীয় বাণী– **كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل** 'তুমি দুনিয়ার বুকে এমনভাবে বসবাস কর যেন তুমি একজন মুসাফির অথবা পথচারী' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫২৭৪)*।

শী'আ মতবাদের বিস্তৃতি

মূল : আব্দুল্লাহ আল-মাত্বরাফী
ভাষান্তর : আব্দুল আলীম বিন কাওছার

অপরাধীর অপরাধ পরিকল্পনা এবং তাদের দুরভিসন্ধি ফাঁস করে দেওয়া মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নির্ধারিত একটি পদ্ধতি। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর এমনিভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করি, যাতে অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে' *(আন'আম ৫৫)*।

আমরা অত্র নিবন্ধে পাঠককে এমন একটি ভয়াবহ বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই, যা নবডঙ্কা নিয়ে বেজে উঠেছে, যার ধূম্রজালে ছেয়ে যাচ্ছে মুসলিম সমাজ এবং যার আগুনে জ্বলে উঠেছে ঈমানী গৃহসমূহ। আর তা হল, ইসলামী বিশ্বে শী'আ মতবাদের ভয়াবহ বিস্তৃতি।

শী'আ মতবাদের বিস্তৃতির ঘটনা বাস্তব, কোন কল্পনাপ্রসূত বিষয় নয়। জাপান থেকে শুরু করে ল্যাটিন আমেরিকা পর্যন্ত পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা এলাকা নেই, যেখানে শী'আ মতবাদের অপচ্ছায়া প্রবেশ করেনি।

এই কুফরী মতবাদ প্রসারের জন্য বিভিন্ন শী'আ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিশেষ এজেন্ডা নিয়ে মুসলিম অঞ্চলসমূহে প্রবেশ করে ইসলামের রজ্জু, আক্বীদা, ইতিহাস ও প্রতীককে লাঞ্ছিত করছে। এমনকি তাদের ক্রমবর্ধমান গোপন তৎপরতা এমন সময় বৃদ্ধি পাচ্ছে যখন ইসলামী সংস্থা ও সংগঠনসমূহ পাপিষ্ঠ খৃষ্টান চক্রের নানা বিপদ ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

তাই তাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধ বিষয়ক আলোচনা সামরিক দখলদারিত্বের আলোচনার চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষ করে এই সংঘাতের যে বাস্তব ফলাফল আমরা লক্ষ্য করছি, তা মুসলিম উম্মাহর জন্য কোন কল্যাণকর ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে না। যাই হোক প্রশ্ন আসে যে, শী'আ মতবাদের বিস্তৃতি সম্পর্কে কেন এই হুঁশিয়ারী দেওয়া হচ্ছে?

এর জবাব হল, আমাদের ও তাদের মধ্যকার দলীল-প্রমাণাদি এতই পরস্পরবিরোধী এবং উভয়ের মধ্যকার মৌলিক বিষয়াদির দূরত্ব এতই বেশী যে, তা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের ন্যায়। এমতবস্থায় কিভাবে আমরা সেই সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারি, যারা আহলে বায়েতের (রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার) ইমামগণকে মা'ছূম বা নিষ্পাপ দাবী করে এবং বিশ্বাস রাখে যে, তাঁরা গায়েব বা অদৃশ্যের খবর রাখেন! *(দ্রঃ কুলায়নী, উছূলুল কাফী ১/১৬৫)*। যারা একথাও বলে যে, কুরআনুল কারীমে পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে এবং আমাদের কাছে সংরক্ষিত কুরআন মূলতঃ নবী (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ কুরআন নয়; বরং তাতে পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও কমবেশী করা হয়েছে! *(দ্রঃ উছূলুল কাফী ১/২৮৫)*। কিভাবে আমরা এমন এক সম্প্রদায়ের নিকটবর্তী হতে পারি, যারা ছাহাবীগণকে ফাসিক্ব বলে? শুধু তাই নয়, যারা উগ্রভাবে নিয়মিত তাঁদেরকে অভিশাপ দিয়ে এবং কাফির বলে নিজেদের জিহ্বাকে ধারালো করে ফেলেছে? *(মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার ৬৯/১৩৭, ১৩৮ পৃঃ)*।

কোন ব্যক্তি ১২ ইমামের ইমামত অস্বীকার করলে সে শী'আ ইমামিয়াদের নিকট কাফির, পথভ্রষ্ট এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী *(আব্দুল্লাহ শুবুর, হাক্কুল ইয়াক্বীন ২/১৮৯)*।

এখানেই শেষ নয়, মুসলিম উম্মাহর সাথে এই সম্প্রদায়ের রয়েছে এক কালো ইতিহাস। সুতরাং আমাদের প্রতি তাদের শত্রুতা যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, তেমনি আমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ ও হিংসাও সুগভীর; বরং মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে এমন কোন সময় অতিবাহিত হয়নি, যখন তাদের আঘাত, গাদ্দারী, বিদ্রোহ আর খেয়ানত মুসলমানদারকে জর্জরিত করেনি। এটিই শী'আদের বাস্তব চিত্র। কবি বলেন, 'তোমরা ইতিহাস পড়, কেননা তা তোমাদের জন্য শিক্ষার ভাণ্ডার। যে জাতি ইতিহাস জানেনা, সে জাতি পথভ্রষ্টই হয়।'

বলা বাহুল্য, স্বীয় মতবাদ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা যেসকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তা প্রকাশ করে দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, তাদের প্রতি যুলম বা অবিচার করা। কেননা আমরা এমন উম্মত যারা ইনছাফ, ন্যায়, দয়া ও মধ্যমপন্থার ঝাণ্ডাকে সবসময় সমুন্নত রাখি।

আল্লাহ্‌র শপথ! বর্তমান দুর্যোগের সময়ে দলীয় সংঘাতের দিকে আহ্বান করা মুসলিম উম্মাহর জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়। কেননা এটি এমন একটি বীজ, যার ফল ভোগ করে ইসলামবিরোধী শক্তি। কিন্তু তারপরও এই মিথ্যার ভয়াবহ বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ দেখে নিশ্চুপ থাকা এবং দেখেও না দেখার ভান করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি বিরুদ্ধ। উপরন্তু যখন শী'আদের এই ধর্মপ্রচার প্রধানতঃ সুন্নী অধ্যুষিত এলাকাসমূহকে টার্গেট করেই পরিচালিত হচ্ছে, তখন এটি কোন হেলাফেলার বিষয় নয়।

অতএব শী'আ মতবাদ কিভাবে বিস্তৃতি লাভ করছে বা কতটা বিপজ্জনক আকার ধারণ করেছে তা অনুধাবন করা এবং একইসাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তা প্রতিরোধের আহ্বান জানানোই এ লেখার একমাত্র উদ্দেশ্য। কোন দলীয় সংঘাত সৃষ্টির কোন অভিপ্রায় এখানে নেই।

ইরানী বিপ্লব ও শী'আ মতবাদ প্রসারের পটভূমিকা :

আধুনিক বিশ্বে শী'আ মতবাদ বিস্তৃতির চিন্তাধারা ইরানী প্রেসিডেন্ট আয়াতুল্লাহ খুমায়নীর শাসনামল থেকে শুরু হয়। যিনি তাঁর অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত 'ইসলামী' বিপ্লবের ঘোষণা দেন।

শী'আ মতবাদ বিস্তৃতির এই এজেণ্ডা 'ফক্বীহী শাসন ব্যবস্থা'র নতুন যুগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শুরু হয়েছে। শী'আদের নিকট 'ফক্বীহী শাসন ব্যবস্থা'র অর্থ হল, ইমামী মাযহাব (শী'আদের একটি গ্রুপ)-এর অনুসারীদের উপর একজন ফক্বীহকে অনুসরণ করা ওয়াজিব, যিনি হবেন অনুপস্থিত প্রতীক্ষিত ইমাম মাহদীর স্থলাভিষিক্ত। খুমায়নী তাঁর গ্রন্থ 'আল-হুকূমাহ আল-ইসলামিইয়াহ'-এর ৩৬ পৃষ্ঠায় 'ফক্বীহ-এর বেলায়াত' বিষয়ক আক্বীদা উল্লেখ করে বলেন, 'ফক্বীহদের উপর এই আক্বীদা পোষণ করা ওয়াজিব যে, তারা আখেরী যামানার প্রতীক্ষিত ইমামের খলীফা বা প্রতিনিধি হবেন এবং তারাই হবেন শাসন ক্ষমতার অধিকারী। এ থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাকে অনুসরণ করা আবশ্যক কেবল একজন ইমাম হিসাবেই নয়; বরং একজন নবী বা রাসূল হিসাবে'। এই ভ্রান্ত আক্বীদার আলোকে ইসলামী বিপ্লবের ঘোষক আয়াতুল্লাহ খুমায়নী তাঁর অনুসারী সম্প্রদায়কে সর্বত্র ধরে রেখেছে, যাতে তারা পরবর্তীতে তাঁর অনুসারী এবং তাঁর নির্দেশ পালনকারী হতে পারে।

বিপ্লব ঘোষণার উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়েই খুমায়নীর সরকার দীর্ঘ আট বছর ধরে ইরাকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, যে ইরাককে ইরানীরা ইসলামী বিশ্বে তাদের প্রবেশদ্বার মনে করে। এছাড়া তাদের আক্বীদায় ইরাকের একটা ধর্মীয় গুরুত্ব তো রয়েছেই। অসংখ্য প্রাণের বিনিময়ে ও ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধনের মধ্য দিয়ে এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইরানের মোড়ল সরকার শুরু থেকেই শী'আ সংখ্যালঘু এলাকাসমূহকে স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবী করার প্ররোচনা দিয়ে আসছিল। যে কারণে সেসময় শী'আদের বেশ কিছু সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দল জন্ম নেয়, বর্তমান বিশ্বে যেগুলির নাম ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন: ইরাকে 'হিযবুদ-দা'ওয়াহ আল-ইসলামিইয়াহ' লেবাননে 'হারাকাতু আমাল' ও 'হিযবুল্লাহ' বাহরাইনে 'জাবহাতুত-তাহরীর আল-ইসলামী', ইয়েমেনে 'আল-হারাকাহ আল-হূছিইয়াহ' ইত্যাদি। এই দলগুলি ইরানী আয়াতুল্লাহ্দের নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরবর্তীতে ছাফাভী পারসিকদের কণ্ঠস্বর ও মুখপাত্রে পরিণত হয়েছে। শক্তি প্রয়োগ করে বিপ্লব ঘটানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় অবশেষে পারসিকরা শান্তিপূর্ণ কূটনীতির মাধ্যমে বিপ্লব প্রতিষ্ঠার বিচক্ষণ নীতি বেছে নিয়েছে। সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক অভীপ্সা, সুগভীর পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য কর্মনীতি সামনে রেখে তারা আগ্রাসীভাবে ইসলামী দেশসমূহে শী'আ মতবাদ বিস্তারের কাজ শুরু করেছে। যা দেশীয় সীমানা বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতাকে কোনই পরওয়া করে না।

এই এজেন্ডাকে সফল করার জন্য শী'আ ধর্মীয় রাষ্ট্রটি সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা করছে এবং নেতৃত্বের আসন দখলের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এই লক্ষ্যে তারা যাবতীয় শক্তি-সম্ভাবনা, সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক বরাদ্দ সবকিছুই নিয়োজিত রেখেছে। শী'আ মতবাদ প্রচারে তারা যে ব্যয় করে তা রীতিমত অবিশ্বাস্য অংকের। শ্রুতি রয়েছে যে, **ইরানী খনিজ তেল থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশের এক পঞ্চমাংশই এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করা হয়**।

খুমায়নী স্বীয় বক্তব্যে তার ভক্তদেরকে শী'আ মতবাদ প্রচারের জন্য উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'ধর্মপ্রচার কেবল ধর্ম মন্ত্রণালয়ের একার দায়িত্ব নয়; বরং তা আলেম, খত্বীব, লেখক ও শিল্পী সবার দায়িত্ব। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্তব্য হল, বহির্দেশীয় দূতাবাসসমূহে প্রচুর পরিমাণে প্রচারপত্র সরবরাহ করা, যা ইসলামের আলোকোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিশ্ববাসীর নিকট অবমুক্ত করবে' *(খুমায়নী, আল-ওয়াছিইয়াহ আস-সিয়াসিইয়াহ, পৃঃ ৪০)*।

এদিকে ইরানের বর্তমান সরকারপ্রধান আহমাদিনেজাদ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, ইরান সরকারের উদ্দেশ্য হল, বিশ্বে শী'আ মতবাদের প্রসার ঘটানো এবং প্রতীক্ষিত মাহদীর নিশান বুলন্দ করা। তিনি বলেন, 'এই আবশ্যকীয় কর্তব্যটি পালনের দায়িত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের উপর বর্তায়' *('মুফাক্কেরাতুল ইসলাম' ওয়েবসাইট থেকে গৃহীত)*।

জনৈক শী'আ আলেম ০৪/০১/১৪২৮ হিঃ তারিখে 'আল-মুসতাক্বেল্লাহ' চ্যানেলে তার এক বিবৃতিতে বলেন, 'শী'আ অধ্যুষিত কুম ও নাজাফ অঞ্চল হেজায, শাম, ইয়েমেন এবং ইরাকে আধিপত্য বিস্তারের সর্বাত্মক প্রয়াস চালাবে। যার উদ্দেশ্য হল, এক সময় গোটা ইসলামী বিশ্বের নেতৃত্ব লাভ করা। এ মতবাদের বিস্তৃতি কোন সীমারেখা মানে না, তাই সারা জাহানে তাদের এই মতবাদ সম্প্রসারণের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

শী'আ মতবাদ প্রচারের কিছু পদ্ধতি :

শী'আ মতবাদ প্রচার এবং তাতে তাদের সফল হওয়ার পেছনে বেশ কিছু পথ ও পদ্ধতি রয়েছে, যার মাঝে উল্লেখযোগ্য হল:

১. আহলে বায়েতের প্রতি ভালবাসার আতিশয্য প্রকাশ : রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের শ্লোগান দেয়া, নিজেদের মতবাদকে তাঁর পরিবারের নামে তথা মাযহাবে আহলে বায়েত নামকরণ, দা'ওয়াতী কার্যক্রমকে মূলতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং তাদের প্রাপ্য হক্ব আদায়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত রাখা– ইত্যাদির মাধ্যমে তারা শী'আ মতবাদের প্রচার করে যাচ্ছে।

এই দাওয়াতের মাধ্যমে শী'আদের উদ্দেশ্য হল, রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি ভালবাসার আতিশয্য প্রকাশ এবং তাঁদেরকে মা'ছূম জ্ঞান করা। আর সেই সূত্রে ছাহাবায়ে কেরামকে রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের অধিকার হরণকারী ও তাঁদের উপর যুলুমকারী হিসাবে আখ্যাদানের মওকা করে নেওয়া (যেমনটি করে চরমপন্থী শী'আ গোষ্ঠী রাফেযীরা)। একে সামনে রেখেই তারা ছাহাবীগণকে অবিশ্রান্ত ভাবে নিন্দা ও কটাক্ষ করা এবং তাদেরকে আমানতের খেয়ানতকারী, অভিশপ্ত, কাফির হিসাবে আখ্যা দেয়ার ন্যক্কারজনক কাজটি অবলীলায় করে থাকে।

অতএব আহলুল বায়েত বা রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের এই ভুয়া শ্লোগান শী'আদের নিজ মতবাদ প্রচারের সূক্ষ্ম অপকৌশল এবং নিজেদের কালিমাযুক্ত চেহারাকে শোভাময় করে দেখানোর অপপ্রয়াস। তাই মানুষকে আকৃষ্ট করতে তারা তাদের দাওয়াহ মিশন, সাহায্য সংস্থা, এমনকি রাজনৈতিক সংগঠনগুলির নামও আহলে বায়েতের নামে নামকরণ করে।

শুধু তাই নয়, আহলে বায়েতের কবরস্থানগুলোকেও তারা মাযারে পরিণত করেছে এবং তার উপর গম্বুজ বানিয়ে নানা বিদ'আতী, কুফরী কার্যকলাপের আসর বসিয়েছে। তাছাড়া এসব অঞ্চল পুরোপুরি শী'আ অধ্যুষিত হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আশেপাশের জায়গা-জমি অধিকারে নেয়া ও জমি কিনে রাখার কাজটিও সুকৌশলে তারা করে যাচ্ছে।

২. সুন্নী ও শী'আদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যের আহ্বান করা :

এটি সুস্পষ্ট ধোঁকা। কেননা এই আহ্বানের অর্থ হল, শী'আ মতবাদকে স্বীকৃতি দেয়া এবং তাদের সঠিকতার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দেয়া- যা প্রকারান্তরে এই মতাবলম্বনের অগ্রযাত্রাকেই সুগম করে। দুঃখের বিষয় হল, এই ধোঁকা দিয়েই শী'আরা সুন্নী মুসলিম অধ্যুষিত দেশসমূহে নির্বিঘ্নে বিচরণ করে তাদের প্রচারকেন্দ্র, প্রকাশনালয় চালু করেছে। সর্বোপরি সহজেই তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রসারের সুযোগ পেয়েছে। অন্যদিকে তাদের বিকৃত আক্বীদাসমূহ এবং কুফরী মতবাদপূর্ণ বিষয়াদির ব্যাপারে কেউ আপত্তি তুললে তা হয়ে যায় মুসলিম ঐক্যের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী।

এক্ষণে সুন্নীদের জানতে চাওয়া উচিৎ, ইরানের শী'আ আলেমরা কি শী'আ অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহে মানুষকে সুন্নী বানানোর প্রক্রিয়া পরিচালনায় অনুমতি দেবে? ইরানীরা সুন্নী হয়ে গেলে কি পারস্য মোড়লরা নীরব থাকবে? আর তারা কি এ ধরনের তৎপরতা অনুমোদন করবে? আল্লাহ্র কসম! তারা এটা কখনই অনুমোদন করবে না। তাই তো দেখা যায়, উভয় জামা'আতকে কাছাকাছি করার এই আহ্বান সত্ত্বেও তারা মানুষকে সুন্নী বানানোর প্রক্রিয়া পরিচালনার অনুমতি দেওয়া তো দূরে থাক, এমনকি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সুন্নী আক্বীদা পাঠকে তারা বাঁধা প্রদান করে থাকে।

বাস্তবতায় দেখা যায়, ধর্মীয়ভাবে কাছাকাছি আসার এই প্রতারণাপূর্ণ আহ্বানকারীরাই সেখানকার সুন্নী আলেমগণকে এবং 'আহওয়ায' অঞ্চলে বসবাসরত আরবদেরকে হত্যা করে গুম করে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা সুন্নী মসজিদসমূহ ধ্বংস করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তালা ঝুলায় আর সুন্নী দাঈগণকে সেখান থেকে বিতাড়ন করে।

অতএব, সুন্নী মুসলিম হিসাবে আমাদের পক্ষে এমন সম্প্রদায়ের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ, তারা ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহকে আঁকড়ে ধরে থাকে, কবরসমূহ প্রদক্ষিণ করে এবং জীবনবাজি রেখে বিদ'আতের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করে।

(৩) শিক্ষাবৃত্তি প্রদান :

তারা ছাত্রদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। এ উদ্দেশ্যে তারা তেহরান, কুম, মাশহাদ ও তাবরীযের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অধ্যয়নের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাযার হাযার সরলমনা মুসলিম যুবককে একত্র করছে। ইরান সরকার সেখানে তাদের খরচ-খরচা, জীবন-যাপন, প্রয়োজনাদি পূরণ এমনকি বিয়ে-শাদীর দায়িত্বও বহন করে থাকে।

এই শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের প্রধান লক্ষ্য হল, তাদেরকে শী'আ বানানো– যাতে তারা শী'আ মতবাদ প্রচার ও প্রসারের আহ্বায়ক হিসাবে নিজ নিজ দেশে কাজ করতে পারে। কয়েক বছর ধরে ছাত্রদেরকে এ মর্মে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সকল সুন্নী সরকার যালেম এবং অবৈধ। কেননা তাদের ধারণামতে, এসব সরকার তাদের ফক্বীহী শাসনব্যবস্থা অর্থাৎ তাদের মতানুযায়ী ইসলামের আসল দল ও মুহাম্মাদী পথের পথিক নয়!

(৪) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দাঈ ও শিক্ষকদের প্রেরণ :

শী'আরা তাদের দাওয়াত প্রসারের লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দাঈদের প্রেরণ করে থাকে। বিশেষ করে দূরবর্তী মুসলিম সংখ্যালঘু এলাকা সমূহে। একটি বিদেশী পত্রিকা এ মর্মে খবর প্রকাশ করেছে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেখানকার সদ্য বিভক্ত অঞ্চলসমূহে ইরান শত শত শিক্ষক পাঠিয়েছে। পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে, এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ইরান সরকার বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে।

(৫) বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ইরানী দূতাবাস সমূহের মাধ্যমে ফায়দা হাছিল করা :

এসব দূতাবাসের সাংস্কৃতিক বিভাগ সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী শী'আদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা, তাদের সমস্যায় সহযোগিতা প্রদান, তাদের অধিকার রক্ষা এবং তাদেরকে শী'আপন্থী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বই-পুস্তক যোগান দেওয়ার মাধ্যমে শী'আ মতবাদের দিকে আহ্বানকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্ত্রণালয়ে পরিণত হয়েছে। এজন্য এমন কোন ইরানী দূতাবাস নেই, যেখানে তথাকথিত পাগড়ীধারী দাঈ এবং শী'আ মতবাদ প্রচারের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নেই।

(৬) অর্থনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার :

অর্থনৈতিক ও বস্তুগত প্রলোভনকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের সুধীদেরকে শী'আ মতবাদে দীক্ষিত করার জন্য তারা অঢেল সম্পদ ব্যয় করে। সাথে সাথে তাঁদেরকে এ ধারণা প্রদান করা যে, ইসলামে শী'আ ও সুন্নীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রিয় পাঠক! একথা সুস্পষ্ট যে, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং গোত্র প্রধানগণের সূত্র ধরেই ইরাক ও সিরিয়াতে শী'আ মতবাদ প্রসার লাভ করেছে *(তাহযীরুল বারিইয়াহ মিন নাশাতিশ-শী'আহ ফী সূরিইয়াহ)*।

(৭) দারিদ্রপীড়িত ও শিক্ষাবঞ্চিত অঞ্চলসমূহকে টার্গেট করা :

শী'আ মতবাদ প্রচারে তাদের আরো একটি মাধ্যম হল, মূর্খতা ও দারিদ্রপীড়িত এলাকাসমূহ খুঁজে টার্গেট করে সেখানে সমাজসেবামূলক কাজ করা। যেমন– হাসপাতাল নির্মাণ, বাড়ী-ঘর নির্মাণ, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং বিভিন্নমুখী সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান ইত্যাদি। ইসলাম এবং আহলুল বায়েতের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের এই খপ্পরে পড়ে ঐসব এলাকার সরলপ্রাণ দরিদ্র লোকজন দলে দলে শী'আ ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে।

(৮) মুসলমানদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সোচ্চার হওয়া :

শী'আ মতবাদ প্রচার ও প্রসারের অন্যতম আরেকটি সহজ মাধ্যম হল, রাজনৈতিকভাবে ইহূদী, জায়োনিস্ট ও পশ্চিমাবিরোধী অবস্থানগ্রহণ করা। মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে শী'আদের চমকদার স্থান এবং নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর হৃদ্যতা অর্জনে তাদের এই নীতির বিরাট প্রভাব রয়েছে। ইরানী মোড়লদের ফিলিস্তীন সমস্যার সমাধানে হাত বাড়ানোর বিষয়টি জনগণের সহানুভূতি আদায় করা এবং দলীয় স্বার্থসিদ্ধি বা রাজনৈতিক স্ট্যান্টবাজি ছাড়া কিছুই নয়। ইরানী সরকার প্রধানের মন্তব্যে তা আরো সুস্পষ্ট হয়। তিনি বলেন, 'ইসলামী দেশসমূহে ইরানের লজিস্টিক সাপোর্ট মূলতঃ দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে' *(ওয়েবসাইট: 'ছহীফাতুল আখবার', জুম'আ সংখ্যা, ২৭ জুন ২০০৮ ইং)*। এই রাজনৈতিকের স্বীকারোক্তিতেই এটা সুস্পষ্ট যে, ইরান কেবলমাত্র তার নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্যই কাজ করে যাচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর স্বার্থে নয়।

(৯) সুন্নী দেশসমূহের উপর আক্রমণ পরিচালনায় বিধর্মী রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করা :

শী'আ মতবাদ প্রচারের একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ হল, এ মতবাদবিরোধী সুন্নী রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিধর্মী দেশসমূহের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা। সেজন্য সেখানকার পাগড়ীধারীরা সবচেয়ে বড় শয়তান আমেরিকাকে যতই গলা বাজিয়ে অভিশাপ করুক না কেন, ইরান সরকার ইরাক এবং এর আগে আফগানিস্তানের পতনের জন্য বিধর্মীদের সহযোগী শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। সাবেক ইরানী ভাইস প্রেসিডেন্ট তা স্পষ্টই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'ইরান না থাকলে আমেরিকা ইরাক দখল করতে পারত না এবং ইরান না থাকলে আমেরিকা আফগানিস্তানও দখল করতে পারত না' *(মাযা তা'রিফু আন হিযবিল্লাহ', পৃঃ ২০৮)*।

(১০) সুন্নীবিরোধী সম্প্রদায়ের সাথে মৈত্রীবন্ধন :

দলীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাদের গৃহীত আরেকটি পদক্ষেপ হল, সুন্নী সমাজের প্রতি বিদ্বেষী সম্প্রদায়গুলির সাথে মৈত্রীবন্ধন গড়ে তোলা। যেমনটি পূর্বে মার্কসবাদীদের সাথে এবং বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে তারা সখ্য গড়ে তুলেছে। সেজন্য শী'আদের প্রচারমাধ্যম এবং তাদের সভা-সমিতিতে সুন্নীবিরোধী এই দলগুলির উপস্থিতি খুঁজে পাবেন। কেননা সুন্নী পরিচয়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের লক্ষ্যে তারা তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই মৈত্রীবন্ধনের আরেকটি উদ্দেশ্য হল, সুন্নীদের অবস্থান নড়বড়ে করা এবং ভেতর থেকে তাদের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করা।

এছাড়া সুন্নীদের কিছু সংস্থার প্রতি শী'আদের সম্মান প্রদর্শনও শী'আ মতবাদ প্রচারের আরেকটি মাধ্যম। দুঃখের বিষয় হল, সুন্নী এই সংস্থাগুলো শী'আ মতবাদকে বৈধতা দান করে তাদের বক্তব্য এবং ফৎওয়া প্রচার করছে। এসব সংস্থার ধ্বজাধারীদেরকে শী'আ মিডিয়ায় ঐক্য ও ন্যায়ের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সম্মানিত পাঠক! শী'আ মতবাদের বিস্তৃতি আশংকাজনক বিপদ হিসাবে রয়ে যাবে এবং ইসলামী কোন এলাকা তাদের টার্গেট থেকে বাদ পড়বে না। বিশেষ করে প্রাচুর্যসমৃদ্ধ ও পবিত্র স্থানসমূহের দেশ হারামাইন শরীফাইনের দেশ সঊদী আরব। এ দেশটি রাফেযীদের টার্গেট। যত্র-তত্র রাফেযীদের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণ ঘটলেও এই দেশটিই তাদের মূল টার্গেট। এটি তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা তোহমত নয়। বরং তাদের বই-পুস্তক এবং ঐসব পাগড়ীধারীদের বক্তব্য থেকেই এই উদ্দেশ্য বেরিয়ে এসেছে।

তেহরানের একজন মেজর জেনারেল 'আল-ইসলাম আলা যওইত তাশাইয়ু' গ্রন্থের লেখক বলেন, 'দুনিয়ার সব শী'আ মক্কা-মদীনার বিজয় এবং এতদুভয় থেকে অপবিত্র ওয়াহ্হাবী সরকারের পতন কামনা করে।' পারস্যের এক পাগড়ীধারী বলেন, 'পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্তের হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা! আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে, আল্লাহ্র হারাম মক্কা মুকাররমা অল্পসংখ্যক এমন কিছু মানুষ দখল করে আছে, যারা ইহুদীদের চেয়েও ভয়ানক' *('আল-মিশকাত আল-ইসলামিইয়াহ' ওয়েবসাইট)*। বাহরাইনের 'কুতলাতুল বিফাক্ব'-এর জনৈক সদস্য হামযাহ আদ-দীরী বলেন, 'সুন্নীদের আলেম-ওলামা এবং হারাম শরীফের ইমামগণ নাছেবী। সুতরাং হারামে তোমাদের ছালাত একজন নাছেবীর পেছনে আদায়কৃত ছালাত হিসাবে গণ্য হবে' *('আল-ওয়াক্ত' পত্রিকা, রবিবার, ২২ রজব ১৪২৮ হিঃ, ৫৩১ সংখ্যা)*।

আর গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের সাবেক প্রেসিডেন্ট রাফসানজানী ১৪/১২/১৯৮৭ ইং তারিখে 'ইত্তেলা'আত' পত্রিকাতে তো স্পষ্টই বলেছিলেন, 'গণপ্রজাতন্ত্রী ইরানের কাছে মক্কাকে মুক্ত করার জন্য যুদ্ধের সার্বিক প্রস্তুতি রয়েছে'।

এদিকে সঊদী শী'আ মতাবলম্বী 'নিম্‌রুন নিম্‌র' তার নিজস্ব ওয়েব সাইট 'আশ-শী'আহ আলাত-তাহাররুক'-এ প্রচারিত এক উস্কানীমূলক বক্তব্যে বলেন, 'আমি নিজেকে আহ্বান করছি এবং সমস্ত মুমিনকে বিশেষ করে আহলুল বায়েতের প্রেমিকদেরকে এবং আরো বিশেষ করে আহলুল বায়েতের মিত্র ও অনুসারীদেরকে শপথ নবায়ন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ এবং আমাদের সম্ভবপর সার্বিক শক্তি দিয়ে দ্বিগুণ প্রচেষ্টায় নিরত হওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। নির্মম ধ্বংসের এক যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই সুউচ্চ ভিত্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা যেন লড়াই-সংগ্রাম অব্যাহত রাখি'। লন্ডনে বসবাসরত কুয়েতী শী'আ মতাবলম্বী ইয়াসের আল-হাবীব এক বক্তব্যে বিদ্রোহের ডাক দিয়ে বলেন, 'মক্কা ও মদীনা আজ দখলদারিত্বের কবলে। এতদুভয়কে মুক্ত করা আবশ্যক'।

এই হল শী'আ মতবাদ বিস্তৃতির কতিপয় মাধ্যম এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও সামান্য কিছু বক্তব্য। সর্বোপরি বাস্তবতা এগুলির সাক্ষ্য দেয় এবং সঠিক বিশ্লেষণ এগুলির সত্যতা প্রমাণ করে *(আরো জানতে হলে পড়ুন : 'আল-খুত্বাতুল খামসিনিইয়াহ লিআয়া-তির রাফিয়া ফী ইরান')*।

প্রিয় পাঠক! এখন বাকী থাকে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন- শী'আ মতবাদ প্রচারের এই ঘূর্ণিঝড় এবং স্পষ্ট বিপদ প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কী?

সম্মানিত মুসলিম ভাই! শরী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যাবশ্যক এবং মুসলিম জনতার জন্য নছীহত হল, যবান ও মাল দ্বারা রাফেযী বিদ'আতের মোকাবেলা করতে হবে এবং দ্বীন ও শরী'আতের হেফাযতার্থে এই বিস্তৃতির ভয়াবহতা সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

আমরা শাসকগোষ্ঠী এবং সাধারণ জনগণ সম্মিলিতভাবে যদি শী'আ মতবাদের এই তুফানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না নেই, তাহলে এর দূষিত হাওয়া আমাদের গায়ে লাগবেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের ঘটনাপুঞ্জ কিন্তু অবাস্তব নয়। সুতরাং দ্বীনের প্রতি অধিক আগ্রহী প্রত্যেকটি মুসলমানের উচিৎ, সর্বশক্তি দিয়ে তার সুন্নী মতবাদকে সহযোগিতা করা। আমাদের করণীয় কয়েকটি বিষয় নীচে সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হল-

১. ইসলামী বিশ্বে সুন্নী মতবাদ প্রসারে আন্তরিকভাবে কাজ করে যেতে হবে এবং এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়নের জন্য দাঈগণ ও ইসলামী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা প্রদান করতে হবে।

২. প্রিন্ট ও অডিও-ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনার মাধ্যমে শী'আ মতবাদের রহস্য বিশ্ববাসীর কাছে উন্মোচন করতে হবে এবং এর আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে হবে।

৩. সুন্নী সমাজে সুন্নী আক্বীদা পাঠদানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে, ছাহাবীগণকে সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁদের সম্পর্কে রাফেযী কর্তৃক সৃষ্ট সন্দেহ ও অস্পষ্টতাসমূহের জবাবদানের বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

৪. আহলে সুন্নাতকে, বিশেষ করে ইসলামী দা'ওয়াতের কর্মীদেরকে তাঁদের নিজেদের মতানৈক্য ভুলে গিয়ে সুন্নী মতবাদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা আমাদের মতানৈক্য আমাদের বিভক্তি ওদুর্বলতার কারণ। আর এই বিভক্তি কেবল শত্রুদের স্বার্থেই কাজে লাগে।

৫. সুন্নী দেশসমূহকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে এবং এমন শক্তি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে, যা সুন্নী দেশসমূহের প্রতি পারসিকদের লোভ-লালসাকে প্রতিহত করতে পারে। বর্তমান শক্তিই হল সব। আজকের বিশ্ব শক্তিশালী ছাড়া কাউকে সমীহ করে না। বিশেষ করে, আজ আমরা প্রতিপক্ষকে নিয়ত ছুরিতে ধার দিতে এবং শক্তি পরীক্ষা করতে দেখতে পাচ্ছি।

৬. ইসলামের দাঈ, মিডিয়ার লোকজন এবং ব্যবসায়ীদেরকে ইসলামী চ্যানেল খুলতে হবে, যা শী'আ মতাবলম্বী উস্কানী সৃষ্টিকারী চ্যানেলগুলির মোকাবেলা করতে পারে। কেননা আজকের যুগ মিডিয়ার যুগ। আর মিডিয়া নামক তরবারী অত্যধিক ধারালো এবং দিগন্ত বিস্তৃত।

৭. আহলে সুন্নাতকে রাফেযীদের আক্বীদা তাদেরই নির্ভরযোগ্য বই-পুস্তক থেকে প্রচার করতে হবে। যুগে যুগে তাদের খেয়ানত এবং মুসলিম উম্মাহর উপর তাদের হিংসার ইতিহাস প্রকাশ করতে হবে। আর এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, এরা তারাই, যারা ঐক্য সৃষ্টি ও পরস্পরে কাছাকাছি আসার মিথ্যা দাবী করে।

৮. আহলে সুন্নাতকে নিজেদের ইতিহাস এবং মুসলিম উম্মাহর আক্বীদা ও ঐক্য সংরক্ষণে তাদের দীর্ঘ পথপরিক্রমা তুলে ধরতে হবে। মুসলিম উম্মাহর পবিত্রস্থানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণে তাদের অবদানের কথাও তুলে ধরতে হবে এবং এটাও উল্লেখ করতে হবে যে, তাদের হাতেই দুনিয়ার সর্বত্র ইসলাম প্রসার লাভ করেছে।

[সেই সাথে আল্লামা ইহসান ইলাহী রচিত আশ-শী'আ ওয়াল কুরআন, আশ-শী'আ ওয়া আহলুল বায়েত, আশ-শী'আ ওয়াস সুন্নাহ প্রভৃতি বইগুলো পড়ুন- অনুবাদক]

পরিশেষে, আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি আমাদের জন্য আমাদের দ্বীন, নিরাপত্তা ও ঈমানকে হেফাযত করুন। তিনি আমাদের শত্রু ও আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের অনিষ্ট থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!

লেখক : দ্বিতীয় বর্ষ, এম,এ (উসূলুদ্দীন) মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়।

আহলেহাদীছ আন্দোলন : তাকলীদী যুগে

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা : আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নিরন্তর দাওয়াতী কাফেলার নাম। যুগে যুগে এ আন্দোলনের উপর শত বাধা-বিপত্তি, হাযারো প্রতিকূলতা, সীমাহীন প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে এ আন্দোলনের দাওয়াতী তৎপরতা অব্যাহত থেকেছে। ভবিষ্যতেও থাকবে মাযহাবীরা ও ভ্রান্ত আক্বীদার লোকেরা যুগে যুগে আহলেহাদীছদের উপর বহু অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। তথাপি তারা এদের গলায় তাকলীদে শাখছীর কণ্ঠহার পরাতে সক্ষম হয়নি, পারেনি কোন ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী করতে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত পারবেও না ইনশাআল্লাহ। বরং এদের আলোক প্রদর্শনে তাদের অনেকে নিজ গলা থেকে তাকলীদে শাখছীর হার ছিঁড়ে ফেলেছে এবং ভবিষ্যতেও ছিড়তে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ। আব্বাসীয় খলীফাদের সময় যখন তাকলীদের জয়জয়কার তখনও আহলেহাদীছ আন্দোলন তার দাওয়াতী মিশনকে অব্যাহত রেখেছিল। এ বিষয়েই নিম্নে আলোচিত হয়েছে।-

এযুগে মু'তাযিলারা রাজনৈতিক ক্ষমতা হারালেও উছূলী বিতর্ক শেষ হয়নি। ইসলামী খেলাফতের সীমানা বৃদ্ধির ফলে নও-মুসলিমদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। আব্বাসীয় খলীফা আল-মামূনের যুগ (১৯৮-২১৮) হ'তে শুরু হওয়া গ্রীক দর্শনের আরবী অনুবাদ এযুগে আরো প্রসারিত হয়ে ইহুদী, খৃষ্টানী, মজূসী, যরদশ্তী, হিন্দুস্তানী (সামানী), তুর্কী, ইরানী ও অন্যান্য অনৈসলামী দর্শনের বইপত্র আরবীতে অনূদিত হয়ে ইসলামী বিশ্বের চিন্তা-চেতনায় এক ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। কুরআন-হাদীছের বাহ্যিক অর্থের অনুসরণে ও ছাহাবা যুগের গৃহীত পথ ছেড়ে দিয়ে বিদ্বানগণ নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানের মাধ্যমে সব কিছুর সমাধান অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন। কালাম ও দর্শন শাস্ত্রের কূটতর্ক, বিভিন্ন মুজতাহিদ ইমামের ফিক্বহী মতপার্থক্য, ছূফীবাদের প্রসার ইত্যাদির কারণে মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। ইমাম গাযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন, এই সময় আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশেষ করে হানাফী-শাফেঈ বিতর্কে ইন্ধন যোগাতে থাকেন। ফলে উভয়পক্ষে বহু ঝগড়া-বিবাদ ও লেখনী পরিচালিত হয়। এই সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬/১৭০৩-১৭৬২) '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের অবস্থা' শিরোনামে বলেন, '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকেরা কেউ কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের উপরে নির্দিষ্টভাবে মুকাল্লিদ ছিলেন না।.. কোন বিষয় সামনে এলে মাযহাব নির্বিশেষে যেকোন বিদ্বানের নিকট হ'তে লোকেরা ফৎওয়া জিজ্ঞেস করে নিতেন।.. আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত তারা আর কারোরই অনুসরণ করতেন না। .. কিন্তু পরবর্তীতে ঘটে গেল অনেক কিছু। যেমন (১) ফিক্হ বিষয়ে মতবিরোধ (২) বিচারকদের অন্যায় বিচার (৩) সমাজ নেতাদের মূর্খতা (৪) হাদীছ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ 'মুহাদ্দিছ' ও 'ফক্বীহ' নামধারী লোকদের নিকটে ফৎওয়া তলব ইত্যাদি কারণে হকপন্থী কিছু লোক বাদে অধিকাংশ লোক হক-বাতিল যাচাই করার মানসিকতা হারিয়ে ফেলে এবং প্রচলিত যেকোন একটি মাযহাবের তাকলীদ করেই ক্ষান্ত হয়। ... বর্তমানে লোকদের অন্তরে তাকলীদ এমনভাবে আসন গেড়ে বসেছে, যেমনভাবে পিঁপড়া সবার অলক্ষ্যে দেহে ঢুকে কামড়ে ধরে থাকে'। তাকলীদের মোহমায়ায় আবদ্ধ হয়ে মানুষ ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কে কত বড় ইমাম বা কে কত বড় দলের অনুসারী, এটাই তখন প্রধান বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাকলীদী গোঁড়ামির কারণে মুসলিম মিল্লাতের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়, তার কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হ'ল।- (১) মাযহাবী তাকলীদের বাড়াবাড়ির পরিণামে হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ও শী'আ মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রে অবশেষে ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁর আক্রমণে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। (২) পরবর্তীতে মিসরের বাহরী মামলূক সুলতান রুকনুদ্দীন বায়বারাসের আমলে (৬৫৮-৬৭৬/১২৬০-১২৭৭ খৃঃ) মিসরীয় রাজধানীতে সর্বপ্রথম চার মাযহাবের লোকদের জন্য পৃথক পৃথক কাযী নিয়োগ করা হয়, যা ৬৬৫ হিজরী থেকে ইসলাম জগতের সর্বত্র চালু হয়ে যায় এবং চার মাযহাবের বহির্ভূত কোন উক্তি বা সিদ্ধান্ত কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'লেও তা অনুসরণ করা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়। (৩) বুরজী মামলূক সুলতান ফারজ বিন বারকূক-এর আমলে (৭৯১-৮১৫হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুকাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র কা'বাগৃহের চারপাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এইভাবে তাকলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে।

১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসকপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আবদুল আযীয আলে-সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী একই ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

বর্তমানে আমরা তাকলীদী যুগেই বাস করছি। যদিও প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত তাকলীদের বিরুদ্ধে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের প্রতিবাদী কণ্ঠ ও লেখনী সোচ্চার আছে এবং তার ফলে অনেকেই তাকলীদের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণে ব্রতী হয়েছেন বা হচ্ছেন। তাকলীদী যুগেও আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও গতিধারা পূর্বের ন্যায় 'প্রচার ও প্রতিরোধ' কৌশলের উপরে ভিত্তিশীল ছিল বা আছে। বিদ'আতী ফেরকাগুলির নেতৃবৃন্দের সাথে তাদেরকে মুখোমুখি তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হ'তে হয়েছে। যেমন ক্বাদারিয়া নেতা গায়লান দামেস্কীর বিরুদ্ধে খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয ও পরে ইমাম আওযাঈর বিতর্ক অনুষ্ঠান; মু'তাযিলা খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহ্র দরবারে তার সাথে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের বিতর্ক অনুষ্ঠান ও নির্যাতন বরণ; খ্যাতনামা আহলেহাদীছ মুফাস্সির ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু জারীর তাবারী (২২৪-৩১০ হিঃ) জনৈক জনপ্রিয় বক্তার ভুল তাফসীরের প্রতিবাদ নিজ ঘরের দরজায় লেখার অপরাধে ভক্ত জনতার অজস্র প্রস্তর বর্ষণে ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া; সুলতানের পক্ষ হ'তে আয়োজিত মিসরীয় আদালত কক্ষে যুগের সেরা ছূফী আলেমদের ভুল আক্বীদার বিরুদ্ধে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ্ (৬৬১-৭২৮)-এর মুখোমুখি তর্কযুদ্ধে জয়লাভ, বিরোধী কুচক্রী আলেমদের ষড়যন্ত্রে ৮ বারে মোট সাত বছর কারা যন্ত্রণা ভোগ ও সেখানেই মৃত্যুবরণ, শিরক ও বিদ'আতী আকীদা ও রস্ম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে ছোট-বড় তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন; তাঁর প্রিয় ছাত্র হাফেয ইবনুল

কাইয়িম (৬৯১-৭৫১)-এর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে হক প্রচার, কারাবরণ ও নির্যাতন ভোগ; প্রচলিত তাকলীদী প্রথার বিরুদ্ধে শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ)-এর লেখনীযুদ্ধ ও কুরআনের ফারসী তরজমা প্রকাশ করায় দিল্লীর আলিমগণ কর্তৃক তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র; ব্যাপক ধর্মীয় অনাচার, শিখ সন্ত্রাস ও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আপোষহীন জিহাদ ঘোষণাকারী পবিত্র কুরআন ও ত্রিশ হাযার হাদীছের স্বনামধন্য হাফেয মুজাহিদ নেতা আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (১১৯৩-১২৪৬ হিঃ)-এর বিরুদ্ধে আলিমদের পক্ষ হ'তে 'কুফরী' ফৎওয়া প্রদান, তাদের চক্রান্তে প্রশাসন কর্তৃক তাঁর ওয়ায-নছীহতের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও অবশেষে এক অসম যুদ্ধে বালাকোট প্রান্তরে শত্রুসৈন্যদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ এবং এ খবর পেয়ে দিল্লীর কিছু আলিমের খুশীতে শিরনী বিতরণ; হাদীছ, তাফসীর, ফিক্হ, আকায়েদ সহ ২২২ খানা গ্রন্থের রচয়িতা, অনুবাদক ও প্রকাশক ভূপালের খ্যাতিমান আলেম, আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীর সিপাহসালার নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩৩-৯০ খৃঃ)-এর অতুলনীয় ইল্মী খিদমত; সুদীর্ঘ ৭৫ বৎসরে প্রায় সোয়া লক্ষ ছাত্রের স্বনামধন্য শিক্ষক শায়খুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলভীর (১২২০-১৩২০হিঃ/১৮০৫-১৯০২খৃঃ) নীরব শিক্ষা বিপ্লব ও কুচক্রী আলিমদের ষড়যন্ত্রে রাওয়ালপিণ্ডির জেলখানায় এক বছর কারা যন্ত্রণা ভোগ, হজ্জের ময়দান থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার বরণ ও বাদশাহ্র দরবারে দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজের স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ ও মুক্তি লাভ; বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও দক্ষিণ এশিয়ার গ্রামে-গঞ্জে আহলেহাদীছ আলিমদের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিকভাবে শিরক ও বিদ'আত বিরোধী নিরন্তর মৌখিক, লৈখিক ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ও নির্যাতন ভোগ- সবকিছুই উক্ত আন্দোলনের অব্যাহত ক্রমবিকাশ ও অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার প্রমাণ বহন করে।

বিভিন্ন যুগে আহলেহাদীছ আন্দোলনের 'প্রচার ও প্রতিরোধ' এই উভয় প্রকার গতিধারা ও ক্রমবিকাশ অব্যাহত ছিল। সেই সাথে আরো উল্লেখ্য যে, ছাহাবা ও তাবেঈন কর্তৃক বিজিত তৎকালীন পৃথিবীর সকল ইসলামী এলাকায় কেবলমাত্র ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূল-এরই গুঞ্জরণ ছিল। বিজিত এলাকায় বিজয়ী সেনাদলের সাথে অথবা বিজয়ের পরপরই সেখানে গমন করতেন দাঈ ও শিক্ষকদের একটি বিরাট দল, যারা সেখানকার অধিবাসীদেরকে কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা দিতেন, যা ছিল নবীযুগের নির্ভেজাল অহিভিত্তিক শিক্ষা। যেখানে ছিল না পরবর্তী যুগের সৃষ্ট কোন দার্শনিক বা ফিক্হী দলাদলির সামান্যতম অবকাশ। সে কারণে বলা চলে যে, বিজেতা ছাহাবী, তাবেঈ ও তাঁদের অনুসারী মুসলিম জনসাধারণ ছিলেন হাদীছপন্থী বা আহলুল হাদীছ। নিঃসন্দেহে এটি ছিল আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিক।

এ পর্যায়ে আমরা উক্ত আন্দোলনের বিকাশধারায় নতুন দিক ও পদ্ধতির সংযোজন লক্ষ্য করব। এই পদ্ধতিটি ছিল হাদীছ সংকলন, গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশনার মাধ্যমে পরিচালিত বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় 'প্রচার ও প্রতিরোধ' কৌশল অব্যাহত রাখা হয়। রাসূলের নির্দেশক্রমে লেখক ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন আমর বিনুল আছ (মৃঃ ৬৫ হিঃ)-এর মাধ্যমে প্রথম হাদীছ সংকলনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীতে খলীফা ওমর বিন আবদুল আযীয (৯৯-১০১) কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছ সংকলনের সূচনা হয়। এই যুগে বিদ'আতী ফেরকা সমূহের উত্থান ঘটায় কেবলমাত্র আহলুস সুন্নাহ বা আহলুল হাদীছ বিদ্বানদের নিকট থেকেই হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। ছহীহ ও জাল হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া তৃতীয় শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে স্বর্ণযুগের সূত্রপাত করে এবং এসময়ে বিশ্ববিশ্রুত কুতুবে সিত্তাহ সংকলিত হয়। রাজনৈতিক বিরোধের সূত্র ধরে যে উছূলী বিতর্কের সূচনা হয় এবং সাথে সাথে ক্বাদারিয়া, জাহ্মিয়া, মুরজিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি মতবাদসমূহের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে যে আকীদাগত বিভ্রান্তি শুরু হয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় শেষোক্ত মতবাদটি যখন ব্যাপকভাবে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখন আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের একটি বিরাট অংশ এসবের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে কলমী যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁরা কুরআন ও হাদীছের প্রকাশ্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করেন এবং ইসলামের নির্ভেজাল আকীদা জনগণের নিকটে তুলে ধরেন, যা ঐসময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নব উদ্ভূত বিদ'আতী দল সমূহের ভ্রান্ত আকীদার প্রতিবাদে এই যুগে কয়েকজন আহলেহাদীছ বিদ্বানের লিখিত বিশেষ কয়েকটি গ্রন্থের নাম পেশ করা হ'ল। যেমন ১- আবু ওবায়েদ কাসেম বিন সাল্লাম (মৃঃ ২২৪ হিঃ) প্রণীত 'কিতাবুল ঈমান' ২- আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ জু'ফী (মৃঃ ২১৯ হিঃ)-এর 'আর-রাদ্দু আলায্ যানাদিক্বাহ ওয়াল জাহ্মিয়াহ'। ৩- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ)-এর 'আর-রাদ্দু আলায্ যানাদিক্বাহ ওয়াল-জাহ্মিয়াহ'। ৪- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল ওরফে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬)-এর 'আর-রাদ্দু আলাল জাহ্মিয়াহ'। ৫- আবদুল্লাহ বিন মুসলিম ওরফে ইমাম ইবনু কুতায়বাহ দীনাওয়ারী (২১৩-২৭৬)-এর 'আল-ইখতিলাফু ফিল-লাফ্যি ওয়ার রাদ্দু আলাল জাহ্মিয়াহ' ও 'তাবীলু মুখতালাফিল হাদীছ'। শেষোক্ত যুগান্তকারী গ্রন্থে লেখক তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের প্রায় সকল বিদ'আতী ফের্কার ভ্রান্ত আকীদাসমূহ খণ্ডন করেছেন এবং বাহ্যত বিরোধী হাদীছসমূহের চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছেন। সাথে সাথে আহলেহাদীছগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের সারগর্ভ জওয়াব দান করেছেন। ৬- ওছমান বিন সাঈদ দারেমী (২০০-২৮০)-এর 'আর-রাদ্দু আলা বিশ্র আল-মুরায়সী'। ৭- আবদুর রহমান বিন আবু হাতিম (মৃঃ ৩২৭ হিঃ)-এর 'আর-রাদ্দু আলাল জাহ্মিয়াহ' প্রভৃতি।

৪র্থ শতাব্দী হিজরী পর্যন্ত প্রণীত উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ কেতাবগুলির নাম লক্ষ্য করলে অনুমিত হয় যে, কেবল জাহ্মিয়াদের বিরুদ্ধেই এযুগে লেখনী পরিচালিত হয়েছিল। মূলতঃ মতবাদের দিক দিয়ে জাহ্মিয়া, ক্বাদারিয়া, জাব্‌রিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ফের্কাগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়ে পরস্পরে সুন্দর মিল রয়েছে। সেকারণ মূল ফের্কাটির শিরোনাম দিয়ে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ সে সময়ের অন্য সকল বিদ'আতী ফের্কার ভ্রান্ত আকীদাসমূহের প্রতিবাদ করেছেন।

অতঃপর ঐসকল গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে, যেখানে কুরআন ও হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামের সঠিক আকীদা পেশ করা হয়েছে।- যেমন ১- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) প্রণীত 'আস্-সুন্নাহ'। অতঃপর একই নামে প্রণীত নিম্নোক্ত বিদ্বানমণ্ডলীর গ্রন্থসমূহ। যেমন ২- ইমাম আবুবকর বিন আছরাম (মৃঃ ২৭২ হিঃ) ৩- আবদুল্লাহ বিন আহমাদ বিন হাম্বল (২১৩-৯০) ৪- মুহাম্মাদ বিন নাছর আল-মারওয়াযী (২০২-২৯৪) ৫- আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন হারূণ আল-খালাল (মৃঃ ৩১১ হিঃ) প্রমুখ। এতদ্ব্যতীত ৬- আবুবকর মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ওরফে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ (২২৩-৩১১) প্রণীত 'আত-তাওহীদ' ৭- আলী বিন ইসমাঈল ওরফে ইমাম আবুল হাসান আশ'আরী (২৬০-৩২৪) প্রণীত 'আল-ইবানাহ আন উছূলিদ দিয়ানাহ্'। আশ'আরী মতবাদের উদ্ভাবক ইমাম আশ'আরী জীবনের শেষদিকে এসে উক্ত মতবাদ পরিত্যাগ করে আহলে সুন্নাত-এর পথে ফিরে আসেন এবং ছহীহ আকীদা সম্বলিত উক্ত কিতাব প্রণয়ন করেন। এই কিতাবে 'প্রচার ও প্রতিরোধ' দু'টি পদ্ধতিই অবলম্বিত হয়েছে। ৮- ওবায়দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন বাত্তাহ (৩৮৭) প্রণীত 'আল-ইবানাহ'। ৯- মুহাম্মাদ বিন ইসহাক ওরফে ইমাম ইবনু মান্দাহ (৩১০-৩৯৫) প্রণীত 'কিতাবুল ঈমান' ১০- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবী যামনীন (-৩৯৯) প্রণীত 'উছূলুস্ সুন্নাহ' প্রভৃতি। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পরবর্তীকালের সেরা গ্রন্থকার হিসাবে সেই সকল আহলেহাদীছ বিদ্বানদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যাঁরা তাঁদের গ্রন্থসমূহে 'প্রচার ও প্রতিরোধ'-এর দ্বিবিধ ধারা অবলম্বনে আহলে সুন্নাতের আকীদা ও আমলকে জনগণের সামনে তুলে ধরেছেন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ধারায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তন্মধ্যে কয়েকজন হ'লেন- ১- ইমাম হিবাতুল্লাহ ইবনুল হাসান লালকাঈ (মৃঃ ৪১৮ হিঃ)। তাঁর রচিত 'শারহু উছূলিল ই'তিক্বাদ' গ্রন্থটি তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। ২- আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯) প্রণীত 'আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ' আকীদা বিষয়ে রচিত তাঁর অন্যতম সেরা গ্রন্থ। ৩- আবু মুহাম্মাদ আলী ইবনে আহমাদ ওরফে ইমাম ইবনু হাযম আন্দালুসী (-৪৫৬) প্রণীত 'কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহ্ওয়া আন নিহাল' তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ। ৪- আবুবকর আহমাদ বিন হুসাইন ওরফে ইমাম বায়হাক্বী (৩৮৪-৪৫৮) রচিত 'আল-ই'তিক্বাদ' আকীদা বিষয়ে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ৫- আহমাদ বিন আবদুল হালীম ওরফে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮) রচিত 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ'-এর মাধ্যমে আহলেহাদীছের আকীদা সুন্দরভাবে তুলে ধরার পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অকাট্য দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে বিদ'আতী ফির্কাসমূহের যুক্তিসমূহ খণ্ডন করে অন্যান্য প্রায় তিন শতাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর লিখিত কিতাবগুলি যুগ যুগ ধরে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পথে আলোকস্তম্ভ হিসাবে কাজ করবে। ৬- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আবুবকর ওরফে ইমাম ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিয়্যাহ (৬৯১-৭৫১) প্রণীত 'মুখ্তাছার ছাওয়াইকুল মুরসালাহ' ৭- আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল বিন ওমর ওরফে হাফেয ইবনু কাছীর (৭০১-৭৭৪) প্রণীত হাদীছ ভিত্তিক তাফসীর 'তাফসীরুল কুরআনিল আযীম' ও বৃহদায়তন ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' তাফসীর ও ইতিহাস শাস্ত্রের অনন্য গ্রন্থ। কুরআনের তাফসীরের নামে বিদ'আতীদের অপতৎপরতার প্রতিরোধে 'তাফসীরে ইবনে কাছীর'-এর অবদান অতুলনীয়। ৮- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মাকদেসী (৭০৫-৭৭৪) প্রণীত 'আছ-ছারিমুল মুনকি ফির-রাদ্দি আলাস সুবকী' সহ শতাধিক খণ্ডে বিভক্ত প্রায় ৭০টি গ্রন্থ শিরক ও বিদ'আতী আকীদা ও রসম-রেওয়াজের বিরুদ্ধে দু'ধারী তরবারি স্বরূপ। ৯- শিহাবুদ্দীন আবুল ফযল আহমাদ ইবনু আলী ওরফে হাফেয ইবনু হাজার আস্ক্বালানী (৭৭৩-৮৫২) প্রণীত বুখারী শরীফের সর্বশেষ বিশ্বস্ত ও বিখ্যাত ভাষ্যগ্রন্থ 'ফাৎহুল বারী' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থাবলী যুগ যুগ ধরে মুসলিম উম্মাহকে যাবতীয় বিদ'আতী আকীদা ও মাযহাবী তাকলীদের বেড়াজাল ছিন্ন করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে আলোকবর্তিকা হিসাবে পথ দেখাবে। উপরোক্ত কেতাবগুলি বিভিন্ন যুগে আলেহাদীছ বিদ্বানদের রচিত অগণিত কিতাবসমূহের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। আরও বহু কিতাব ছিল, যা হয়তবা হারিয়ে গেছে। নয়তবা আজও ছাপার মুখ দেখেনি কিংবা এখনও কোন প্রাচীন লাইব্রেরীর অন্ধ প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে প্রকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

উপরোক্ত কিতাব সমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল একটিই-মুসলিম উম্মাহ্‌কে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা এবং ঐ দুই উৎসের সঠিক বুঝ হাছিলের জন্য সালাফে ছালেহীনের গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং নবোদ্ভূত মতবাদ ও কল্পিত মাযহাবসমূহ হ'তে বিরত রাখা। আর এটাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মুসলিম উম্মাহ্‌কে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনাই উপরোক্ত কিতাব সমূহের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এবং ঐ দুই উৎসের সঠিক বুঝ হাছিলের জন্য সালাফে ছালেহীনের গৃহীত পদ্ধতি অনুসরণ করা এবং নবোদ্ভূত মতবাদ ও কল্পিত মাযহাবসমূহ হ'তে বিরত রাখা। আর এটাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

মুসলমানদের মধ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনই চিরকাল শিরক ও বিদ'আত সহ সকল প্রকার ভ্রান্ত আক্বীদা ও ধর্মের নামে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিজাতীয় রসম-রেওয়াজের বিরোধিতা করে এসেছে এবং কুরআন ও হাদীছের নির্ভেজাল সত্যকে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে। কোন বাধা-বিপত্তিকে তারা তোয়াক্কা করেনি; বরং সদা সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। তাই আমরা বলতে পারি যে, নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আহলেহাদীছ আন্দোলন এক অপ্রতিরোধ্য কাফেলার নাম। এ কাফেলা লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াতকে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এ দাওয়াতকে গ্রন্থাবদ্ধ করে আহলেহাদীছ বিদ্বানগণ একে স্থায়ীত্ব ও অমরত্ব দান করেছেন। সুতরাং রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্বিয়ামত পর্যন্ত হকের এ দাওয়াতী কাফেলা টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব আসুন, আমরা এ হকের দাওয়াতী কাফেলায় শরীক হয়ে দ্বীনে হকের দাওয়াতকে বুলন্দ করি এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ হাছিলে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

অবশেষে পীস টিভিতে

মুযাফফর বিন মুহসিন

১৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৯। বাদ আছর ফাতাওয়া বোর্ড চলছিল। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (বোর্ড প্রধান), আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ (সদস্য) মাওলানা বদীউযযামান (সদস্য) ও আমি উপস্থিত ছিলাম। মাগরিবের আযানের পূর্ব মুহূর্ত। হঠাৎ মোবাইলে রিং বেজে উঠল। দেখলাম বিদেশী নম্বর। রিসিভ করে সালাম দিলাম। প্রত্যুত্তরে জবাব এল, 'আমি নূরুল ইসলাম বলছি মুম্বাই থেকে। আমি ডক্টর ছাহেবকে চাচ্ছি। উনার বাসার নম্বরে ফোন দিলে এই নম্বরে ফোন করতে বলা হয়েছে।' মোবাইল ফোনটি স্যারের হাতে দিয়ে বললাম, ইন্ডিয়া থেকে আপনার ফোন এসেছে। মোবাইল হাতে নিয়ে সালাম বিনিময়ের পর স্যার বললেন, আমাদের এখানে মাগরিবের সময় হয়ে গেছে। আপনি আধা ঘণ্টা পরে ফোন করুন, ছালাতের পর কথা হবে।

মাগরিব ছালাতের পর আবার ফোন আসল। বেশ দীর্ঘ সময় ধরে কথা হল। আমরা সবাই অধির আগ্রহে বসে আছি। স্যার ফোন রেখে বললেন, আব্দুর রাযযাক ছাহেব আলহামদুলিল্লাহ পড়ুন। আনন্দের সাথে তিনি জানালেন, বাতিলরা যখন দেশে আমাদের দাওয়াতী কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে চাচ্ছে, আল্লাহ তখন আমাদের জন্য আন্তর্জাতিক দুয়ার খুলে দিতে চাচ্ছেন। ডা. যাকির নায়েক পীস টিভিতে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। উনারা পিস টিভির বাংলা বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই আমার কাছে ছহীহ আক্বীদার আলোচক চেয়েছেন। এভাবেই শুরু হল আমাদের নতুন অভিযাত্রা। কয়েকদিন পরই আমীরে জামা'আতের নির্দেশে ড. সাখাওয়াত ভাই বক্তা হিসাবে ১২ জনের নাম নির্বাচন করে তাদের সবার বায়োডাটা ও অডিও-ভিডিও বক্তব্যের ক্লিপ মুম্বাইয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর অপেক্ষার পালা।

৫ই মে ২০১০ বুধবার। মাগরিবের ছালাতের আযানের মুহূর্ত। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় অফিসে বসা। মোবাইল বেজে উঠল। বললেন, 'মুম্বাই থেকে নূরুল ইসলাম বলছি। আপনাদের যে তালিকা পাঠানো হয়েছিল তাদের মধ্য হতে আমাদের নির্বাচনী বোর্ড ৬ জনকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করেছেন। সেই ৬ জন কে? আমার ধারণা ছিল যে, আমার নাম সেই তালিকায় নেই। কেননা আমি তো জুনিয়র মোস্ট। এরপরও বললাম, নামগুলো কি জানতে পারি? উনি একের পর এক বলে গেলেন– 'প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুযাফফর বিন মুহসিন এবং আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী (সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, ঢাকা যেলা)। এরপরে যোগ হয়েছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ (ইমাম, সোবহানবাগ মসজিদ, ঢাকা) এবং সঊদী আরব থেকে হাফেয আখতার। আপনাদের নামে ফ্যাক্স যোগে ইনভাইটেশন লেটার পাঠালাম। অতি সত্বর পাসপোর্ট করে ভিসার আবেদন করুন। আগামী জুনের ১৭ তারিখ থেকে আপনাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে।' অতঃপর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের আলোচনার বিষয় জানিয়ে দেওয়া হল।

ব্যস্ততার কারণে আমীরে জামা'আত সফর বাতিল করলেন। তাই আমরা তিনজন পাসপোর্ট করলাম। ইনভাইটেশন লেটারসহ ভিসার জন্য ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে আবেদন করলাম। বিনা বাক্যে পাসপোর্ট ফেরত দিল দূতাবাস। অন্যের মাধ্যমে চেষ্টা করেও ভিসার কোন ব্যবস্থা করা গেল না। অবশেষে পীস টিভি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে এসে প্রোগ্রাম করার সিদ্ধান্ত নিল। তার সাথে ডা. যাকির ছাহেবও আসবেন বলে জানানো হল। ৩১ আগস্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত তারা বক্তব্য রেকর্ড করবেন। আমরা প্রস্তুতি নিলাম বিষয় অনুযায়ী। ঢাকায় আমাদের জন্য হোটেলও ভাড়া করা হল। বিভিন্ন স্টুডিও প্রস্তুত করা হল। ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর চীনমৈত্রী (বঙ্গবন্ধু) সম্মেলন কেন্দ্রে ওপেন প্রোগ্রাম হবে বলে ভাড়া করা হল। মুম্বাই থেকেও জানানো হল, তারা প্রায় ত্রিশ জন ভিসার আবেদন করেছেন। ৩১ শে আগস্ট বাংলাদেশে আসবেন। পরে তারা জানালেন, বাংলাদেশ দূতাবাস তাদের পাসপোর্ট ফেরত দিয়েছে। আমরাও নিরাশ হলাম, আর পীস টিভিতে আলোচনা করার সুযোগ হল না।

ডিসেম্বরের শেষে আবার প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় মুম্বাইয়ে। আমাদের জন্য আবার দাওয়াতপত্র পাঠানো হল। এবার আমরা ভারতীয় দূতাবাসের রাজশাহী অফিসে আবেদন করলাম স্থলপথে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এখানেও বার বার ঘুরানো হল। অবশেষে ৯ জানুয়ারী ২০১১ দেখা করার জন্য বললেন স্থানীয় অফিস প্রধান। সে মোতাবেক সাক্ষাৎ করলাম। কিন্তু তিনি বলে দিলেন, ১৩ জানুয়ারী আসুন। বুঝা গেল এবারেও তারা ভিসা দিবে না।

ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসছি। তখন বিকাল ৩.২০। রুমে ঢুকছি। মুম্বাইয়ের ফোন। জিজ্ঞেস করলেন, ভিসা কি পেয়েছেন? বললাম, না। তিনি বললেন, পাসপোর্ট ফেরত দিয়েছে তো? দিয়েছে। তিনি বললেন, তাহলে আমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ি! আমি হতবাক। বাঁকা করে বললেন, তাদের ভিসার আর দরকার নেই। রাত্রে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১১ দুবাইয়ে আপনাদের প্রোগ্রাম শুরু হবে। আপনাদের পাসপোর্টগুলো স্ক্যান করে ইমেইলে পাঠিয়ে দিন। আমরাই ভিসা করে দিচ্ছি। ফালিল্লাহিল হামদ।

অতঃপর চলে আসল সেই কাংখিত শুভক্ষণ। সিদ্ধান্ত হল ১৮ ফেব্রুয়ারীতে যাওয়ার। কিন্তু আবারও বাধা। কারণ তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী। যাহোক ইজতেমার ঠিক পরদিনই যাত্রাক্ষণ নির্ধারিত হল।

আরেকটা কথা, যখন দুবাইয়ে প্রোগ্রামের সিদ্ধান্ত হল, তখন পীস টিভি কর্তৃপক্ষ আরো কয়েকজন আলোচক নেওয়ার জন্য আমীরে জামা'আতের সাথে পরামর্শ করলেন। অনেকে ব্যক্তিগতভাবেও তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। ফলে সে সূত্রে ড. মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), হারুণ হুসাইন (সিলেট), সাইফুদ্দীন বেলাল (দিনাজপুর), ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী (ঠাকুরগাঁ) প্রমুখ আমাদের সাথে সঙ্গী হলেন। নির্ধারিত ১৮ তারিখেই তাঁরা রওয়ানা হয়েছিলেন।

১৯ই ফেব্রুয়ারী রাত ৯.১৫ মিনিটে আমাদের ফ্লাইট। সকাল ৯টায় আমি ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমীরে জামা'আত আমাদের দীর্ঘ নছীহত

করলেন এবং রাস্তা পর্যন্ত এসে বিদায় দিলেন। দুপুরের পর ঢাকায় উত্তরখানে গিয়ে মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানীর বাসায় উঠলাম। সাড়ে পাঁচটার দিকে ঢাকা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম তিন জন এক সঙ্গে। আমার প্রথম বিদেশযাত্রা। আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল মাদানী ছাহেবের অভিজ্ঞতা অনেক। আর আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ওস্তাদজীর একবারের হজ্জের অভিজ্ঞতা। বিমানবন্দরে ঢুকেই আমানুল্লাহ মাদানী আমাদেরকে নিয়ে বিমানের টিকিটটা নিয়ে নিলেন। একটু পরেই আসলেন জনাব শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও সদ্য যোগ হওয়া ইউসুফ আব্দুল মাজীদ (ঢাকা)।

এরপর নতুন অভিজ্ঞতা। ইমিগ্রেশনে গিয়ে আটকা পড়লাম। প্রশাসনের লোকেরা দীর্ঘক্ষণ আমাদের বসিয়ে রাখল। কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, আপনাদের কে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইত্যাদি প্রশ্ন। তিন ঘণ্টা পর যখন বিমানের সকল যাত্রী উঠে গেছে তখন সত্বর বিমান ছেড়ে যাবে বলে আমাদের জন্য বার বার এনাউন্স করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে। বিরাট অনিশ্চয়তার ছাপ সবার চোখেমুখে। অবশেষে তারা নিজেরাই আমাদের বিষয়ে তদন্ত করল এবং ছাড়পত্র দিল। ফালিল্লাহিল হামদ!

অপেক্ষায় থাকার কারণে আমাদের টাকা ভাঙিয়ে ডলার করা হল না। বিমান ছাড়ার মুহূর্ত। সবাই বিমানে উঠে গেছেন। আমি নেই। গেটে আটকে গেছি। দেশীয় টাকা দুই হাযারের বেশী নিয়ে যেতে দিবে না। আমি বললাম, আমাদের তো সুযোগই দিলেন না, দুবাই বিমান বন্দরে ডলার চেঞ্জ করে নেব। একজন আমাকে যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত দিলেন, আমি যেতে থাকলাম। কিন্তু অন্যজন বাধা দিলেন। বিমানের গেট থেকে বার বার সংকেত দেওয়া হচ্ছে। আমি মাঝে আটকানো। পরে একটু রেগে গিয়ে চলে গেলাম। বিমানে উঠে সিটে বসার পরে দীর্ঘ সাড়ে তিন ঘণ্টার পেরেশানী কমল। ভারাক্রান্ত মনে একটু দম ধরে থাকলাম। আয়নায় নিজের থমথমে চেহারা দেখে চেতনা ফিরল।

বিমান ছাড়ল রানওয়েতে অনেকক্ষণ অবস্থান করার পর। তখন রাত্রি ৯.৩৭ মিনিট। ভাগ্য ভাল যে সিট ছিল জানালার পাশেই। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখা যাচ্ছিল আলোর বৈচিত্র্য। বিশেষ করে বিমান যখন দুবাই ছুঁই ছুঁই, তখন সাগরের মাঝে দেখা যাচ্ছিল অতি স্বচ্ছ ও পরিষ্কার চাঁদ ও তারা। যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে যা দেখি তার চেয়েও হাযার গুণে সুন্দর। ঝকঝকে তারাগুলো যেন সাগরের মাঝেই তৈরি রয়েছে। অতঃপর দুবাইয়ের সারি সারি বিল্ডিং। পুরো দেশটি যেন এক তারার মেলা, মুক্তখচিত। নিপুণভাবে কোন শিল্পী যেন সাজিয়েছে। সবই উপভোগ করছিলাম বিমান থেকে। খানিকবাদে দেখতে দেখতেই বিমান ল্যান্ড করল। সুবহানাল্লাহ! কি বিশাল বিমানবন্দর আর কত যে বিমান!!

তখন রাত্রি ১টা ৪০ মিনিট। দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ইমিগ্রেশনে অনেক ভিড়। বেশ দেরী হল। অবশেষে বের হলাম। মার্নিশ নামে এক ব্যক্তি আসল। সে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ড্রাইভার। গাড়ীতে উঠে সর্ববৃহৎ বিল্ডিং বুর্জ খলীফার পাশ দিয়ে আমাদের নিয়ে গেল ক্যাসল আল-বারশা হোটেলে। প্রথমবারের মত দেখলাম দীর্ঘদিনের পরিচিত সেই শায়খ নূরুল ইসলাম ভাইকে। তিনিই আমাদেরকে রিসিভ করলেন। আগে থেকেই হোটেলের সীট বরাদ্দ ছিল। সেখানে গিয়ে উঠলাম। হালকা নাস্তার পর শায়খ নূরুল ইসলামের মোবাইল থেকে আমাদের পৌঁছার খবর জানালাম আমীরে জামা'আতকে ।

অতঃপর হোটেলে সাক্ষাৎ হল সঊদী আরব থেকে আসা হাফেয আখতার মাদানী (নওগাঁ), লন্ডন থেকে আসা ড. আবুল কালাম মাদানী (যশোর), ড. আব্দুস সালাম (সাতক্ষীরা), ড. আব্দুর রহমান (বাগেরহাট)-এর সাথে। তারা লন্ডনে একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। আর সফরের শেষভাগে এক সপ্তাহের জন্য গেলেন অধ্যাপক ড. লোকমান হুসাইন (প্রফেসর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া) ও ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী (ময়মনসিংহ)।

২০শে ফেব্রুয়ারী। দুপুর আড়াইটার দিকে প্রোগ্রামে যেতে হবে। হোটেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করছি। গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছেন হাফেয আখতার, হারুণ হুসাইন। উভয়েরই মাথায় সঊদী রুমাল। হাফেয আখতার ভাইকে সহজে চিনতে পারলেও হারুণ ছাহেবকে চিনতে দেরী হয়েছে। ইতোমধ্যে কুশল বিনিময়। আমি নাম বলতেই বললেন, 'তুমিই মুযাফফর। তোমাকে দেখার ইচ্ছা ছিল। আমি হারুণ হুসাইন।'

গাড়িতে উঠে চললাম মিরদিফ সিটির পথে। রাস্তার দুই পার্শ্বে খেজুর গাছ। একেকটি গাছ বিরাট পাতার বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবগুলোই সমান সৌন্দর্য বহন করছে। কারণ উপরের শাখাটি যত সুন্দর, নীচের শাখাটিও অনুরূপ। পৌঁছলাম এক সুসজ্জিত বিল্ডিংয়ে। প্রোগ্রাম রেকর্ডের প্রথম অভিজ্ঞতা। মানুষ নেই। শুধু ক্যামেরাকে সামনে রেখে বলছি, সম্মানিত উপস্থিতি!! ক্যামেরাই যেন দর্শক শ্রোতা। দীর্ঘ সফরে কয়েক ক্যাটাগরীতে প্রোগ্রাম ধারণ করা হয়েছিল যেমন– (ক) একক বক্তব্য বা টিভি টক। এটা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় (খ) দারস (নির্বাচিত গ্রন্থ)। এটা হয়েছে জিতে ও মিডিয়া সিটিতে (গ) গ্রুপ ডিসকাশন। এটা হয়েছে মিডিয়া সিটিতে।

প্রোগ্রাম চলতে থাকল। খাওয়া-দাওয়ায় প্রথম দিকে সমস্যা হলেও পরে তা কেটে যায়। দেশীয় খাবারের সাথে কোন মিল নেই। ভাত পাওয়া যায় অনেক কষ্টে। বাঙালী তরি-তরকারী তো সোনার হরিণ।

উন্নত মানের হোটেলে অনেক রকমের খানা থাকলেও আমার পসন্দ হয়নি। আব্দুর রাযযাক ওস্তাদজীরও একই অবস্থা। অবশেষে পাশের পাকিস্তানী হোটেলে খাওয়া-দাওয়া শুরু হল। প্রথম দিন। হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী খাবারের শুরুতেই অনেক সালাদ দিল। দেখতে প্রায় ঘাসের মত। সবাই টেবিলে বসা। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ চাঁপাই দেশীয় ভঙ্গিতে ফোড়ন কেটে বললেন, 'আমরা গরু নাকি, ঘাস খেতে দিয়েছে?' হা.হা..।

প্রথম দিনই পরিচয় হয়েছিল দেশীয় ভাই আলী রেযা (নারায়ণগঞ্জ) ও সাজীদ (নরসিংদী)-এর সাথে। ভাই আলী রেযা দুবাইয়ের প্রায় সব দাঈ সেন্টারগুলোর সাথেই পরিচিত। ডা. যাকির নায়েকের সাথেও

তার ভাল সম্পর্ক। ফলে পীস টিভি কর্তৃপক্ষের সাথে তিনি সময় দেন। উভয়েই উচ্চ বেতনের চাকরী করেন অনেক দিন যাবৎ। অফিস

ডলফিন টাওয়ার, দুবাই

বুর্জ আল-খলীফা, দুবাই

টাইমের পর তার গাড়ীতে করে বিভিন্ন শহরে আমাকে নিয়ে যেতেন। প্রায় সময় সাজীদ ভাইও থাকতেন। সেই সুবাদে দেখা হল, ১৬৩ তলাবিশিষ্ট বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার বুর্জ খলীফা, বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঝর্ণা, দুবাই মল, ইমারত মল, ডলফিন টাওয়ার, শারজাহ শহর ইত্যাদি।

৭ই মার্চ সোমবার। গেলাম জনবহুল শহর দিয়ারাতে। এতদিন মনে হয়েছে দুবাইতে লোকসংখ্যা তেমন নেই। কিন্তু সেখানে গিয়ে মানুষের সন্ধান পেলাম। সাজীদ ভাই আমাকে নিয়ে গেলেন এক আতরের সেন্টারে। আগেই বলে রেখেছিলেন পীস টিভিতে আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ থেকে আহলেহাদীছ শায়খরা এসেছেন। ভিতরে ঢুকেই দেখা ভাই আতীফের সাথে। দেশের বাড়ী তার মুম্বাই। কিন্তু ৩০ বছর যাবৎ সেখানে থাকে পিতা-মাতা ভাই বোনসহ। উর্দূতে তার সাথে কথা হল। আমার যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। বাংলাদেশের অবস্থা জানতেই জিজ্ঞেস করলেন, ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে কি চেনেন? তার পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তিনি কি এখনো কারারুদ্ধ? বললাম, প্রায় এক বছর যাবৎ বাইরে আছেন আল্লাহর রহমতে। এরপর অনেক কথা। যখন বললাম আহলেহাদীছদের বিশাল তাবলীগী ইজতেমার কথা, তখন তিনি খুশী হয়ে বললেন, বাংলাদেশে এত আহলেহাদীছ আছে? আমার ধারণা সেখানে শুধু বিদ'আতীদের ইজতেমা হয়? খুশী হয়ে বললেন, আগামী ইজতেমার কথা আমাকে জানাবেন। আমি আপনাদের সাথে শরীক হব। এরপর তার পরিচিত বরিশালের এক ভাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, ইনি ইলিয়াসী তাবলীগের অনুসারী। একটু দাওয়াতী কাজ করুন আপনার ভাষায়। অনুরূপ আরেক ভাইকে ডেকে নিয়ে বললেন, ইনি হলেন, মওদূদীপন্থী জামায়াতে ইসলামীর অনুসারী আর ইনি হলেন চরমোনাই আক্বীদার মানুষ। একটু দাওয়াত দিন। আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আমি সবার সাথে পরিচিত হলাম। বেশ কিছুক্ষণ কথা হল। তারা জানালেন, ভাই আতিফ আমাদেরকে অনেক এগিয়ে নিয়ে এসেছেন। সঠিক দ্বীনটি প্রায়ই বুঝেছি। আমাদের জন্য দো'আ করবেন। আমি তাদেরকে মাসিক আত-তাহরীক ও ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পড়ার আহ্বান জানালাম এবং সাজীদ ভাইয়ের নিকট থেকে সংগ্রহ করার জন্য বললাম।

আমার নিজের কিছু কাজ সেরে ফেললাম। এখন বিদায়ের পালা। আতীফ ভাই প্রথমে সবচেয়ে দামী আতর হাদিয়া দিলেন আমীরে জামা'আতের জন্য। আমার হাতে একটি দিয়ে রসচ্ছলে বললেন, পসন্দ না হলে আপনার ঘরে শুধু রেখে দিবেন। তবুও আমাদের মনে রাখবেন। অতঃপর আমাদের সকল আলোচককে ১৬ তারিখে দাওয়াত দিলেন। আমাদের নিয়ে হোটেলে একটি প্রোগ্রামের আয়োজন করবেন এজন্য। আমি সম্ভবপর ওয়াদা দিলাম। অতঃপর আলী রেযা ভাইয়ের দাওয়াতে সাড়া দিয়ে তার বাড়ীতে গেলাম। মনে পড়ে তার শিশু বাচ্চা তালহার কথা। ফুলের মত ফুটফুটে সুন্দর। রাত ভারী হয়ে গেল। গাড়ীতে করে আমাকে রেখে গেলেন হোটেলে।

সেদিন শুক্রবার। ১১ই মার্চ। সকালে প্রোগ্রাম ছিল না। আলী রেযা ও সাজীদ ভাইয়েরও অফিস বন্ধ। তিনজনে গেলাম আবুধাবীতে। যাওয়ার পথে নানা দৃশ্য তো দেখা হলই। তার মধ্যে ব্যতিক্রম দেখলাম একটি লেক। লেকের পার্শ্বে রয়েছে একটি ফুলের গাছ। এত সুন্দর ও বড় ফুলের গাছ হয় সেটা কখনো ধারণায় ছিল না। সেখান থেকে গেলাম বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম শেখ যায়েদ মসজিদ দেখতে। সৌন্দর্যমণ্ডিত এই মসজিদের পাথর, নকশা, ঝাড়বাতি, কার্পেট সবই ব্যতিক্রম। পুরো মসজিদে মিলে একটি কার্পেট। তৈরি করতে সময় লেগেছে মাত্র ১০ বছর। তবে মসজিদের উত্তরপার্শ্বে রয়েছে শেখ যায়েদের কবর। পার্শ্বে ছোট্ট ঘর থেকে একজন হাফেয কুরআন পড়ছেন। কবরের কাছে আছে সাউন্ড বক্স। এই তেলাওয়াত ২৪ ঘণ্টা পালাক্রমে চলে। হাফেযদের বেতন অনেক। ছবি তুলতে গেলে মিসরী রক্ষীবাহিনী বাধা দেয়। আমি তার সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ি। ছবি তোলা নাজায়েয, কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কবরপূজা জায়েয? একটু সামনে কুরআন পাঠরত হাফেযকেও বললাম। তখন সাথী ভাই আমাকে নিষেধ করলেন। তবে মসজিদটা যে কত সুন্দর তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য হল, বাংলাদেশী ভাইয়েরা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন মর্মে আসছিলেন। কিন্তু গাড়ীতে সমস্যা হওয়ায় মাঝপথে আটকে যান। তাদের সাথে আর দেখা হল না।

১৩ই মার্চ আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলেন পীস টিভির ভাইস প্রেসিডেন্ট নাজিমুদ্দীন। আলী রেযা ভাইয়ের সাথে সরাসরি আসলেন আমার রুমে। ডা. যাকির নায়েকের পক্ষ থেকে আমাদের সালাম জানালেন। তিনি আপনাদের সাথে দেখা করার ইচ্ছা করলেও সঊদী আরব থেকে কাতার এসে সময় বেশী লাগছে। হাফেয আখতার, আমানুল্লাহ মাদানী সবাই মিলে তার সাথে আলোচনা চলল প্রোগ্রাম রেকর্ডের বিভিন্ন দিক নিয়ে। ইতিমধ্যে আসলেন জনাব আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। আলী রেযা ভাই পরিচয় করিয়ে দিলেন- এই শায়খ আলোচকদের মধ্যে মুরব্বী ও অনেক সম্মানের অধিকারী। অতঃপর তার সৌজন্যে পার্শ্বে হোটেলে সর্বোন্নত খানার ব্যবস্থা করা হল। খাবার শেষে আমাদের সবাইকে একটি করে দামী ঘড়ি উপহার দিলেন। প্রথমেই খোঁজ করলেন, শায়খ আব্দুর রাযযাককে। কিন্তু তিনি ইতিমধ্যে রুমে চলে গেছেন। অবশেষে আমাকে ধরিয়ে দিলেন তার ছাত্র হিসাবে। তারপর অন্যদেরকে হাতে তুলে দিলেন। পীস টিভির পক্ষ থেকে এটাই ছিল আমাদের জন্য একমাত্র উপহার।

১৫ই মার্চ আমাদের প্রোগ্রাম শেষ। সেদিন প্রোগ্রাম চলছিল জাহাজের উপর। দুবাইয়ের পাশ দিয়ে যে সাগর ও লেক রয়েছে তার মাঝে। সাগরের ঢেউ ও মনোরম দৃশ্য ক্যামেরাবন্দী করাই এর উদ্দেশ্য। কেন যেন এই সৌভাগ্য উস্তাদ-শাগরেদেরই হল। রেকর্ডের পরিচালক ইযহার ফারীদী। ধূমপানে অভ্যস্ত এক বিচিত্র মানুষ। যা ছিল আমাদের জন্য অসহ্যকর। সামনে ধূমপান করার সাহস তার হত না। দুর্গন্ধ পেলে উস্তাদযী কড়া ভাষায় ধমকে দিতেন আর ধূমপান ছাড়ার

নছীহত করতেন। অবশেষে ফরীদী ছাহেব অঙ্গীকার করলেন যে, এই অভ্যাস তিনি ত্যাগ করবেন। শেষের দিন প্রোগ্রাম থেকে বিদায়ের মুহূর্তে আমাদেরকে সাক্ষী রেখে নিজের কাছে রক্ষিত সিগারেটের প্যাকেট ডাস্টবিনে ফেলে তিনি উস্তাদযীর কাছে হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করলেন- হে আল্লাহ! আমি আর কোনদিন ধূমপান করব না। আমাকে এই ওয়াদা পালনের তাওফীক দাও! আমীন! মুম্বাই থেকে

মামযার পার্ক, দুবাই

আসা শেখ আব্দুল মতীন বললেন, এতদিন তিনি কারো নছীহত গ্রহণ করেননি। এটা আপনাদের বড় পাওয়া। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

১৬ই মার্চ পুরো দিন ছুটি পেলাম। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, হাফেয আখতার ও আমি তো আনন্দে আটখানা। কারণ আমাদের প্রতি খুশি হয়ে তারা দুবাই ঘুরার সুযোগ দিলেন। প্রোগ্রামের হিসাব শেষ। টিভি টকে আমার বিষয় ছিল- (১) শরী'আত অনুসরণের মূলনীতি (২) যঈফ ও জাল হাদীছের কুপ্রভাব (৩) ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (৪) ইসলাম ও জাহেলিয়াত (৫) সমাজ সংস্কার (৬) দাওয়াতী কাজে সফলতার স্বরূপ (৭) আমলে ছালেহ (৮) তাক্বওয়া ও তার দৃষ্টান্ত (৯) ইসলাম বনাম ফের্কাবন্দী (১০) ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ) (১১) তরুণদের প্রতি আহ্বান (১২) অহির বিধানের অনুসরণ। মোট পর্ব হয়েছে ৯০টি। আর গ্রুপ ডিস্কাশন প্রায় ৮২টি।

ভাই আলী রেযা ও সাজীদ শেষবারের মত সময় দেওয়ার জন্য আমাকে নিয়ে লাইব্রেরী গেলেন। আমার গবেষণার জন্য কোন গ্রন্থ পাই কি-না সেজন্যই বের হওয়া। সেই সাথে আতিফ ভাইয়ের প্রোগ্রামে যোগ দিতে হবে। লাইব্রেরীতে গিয়ে বই দেখছিলাম আর দু'একটি নির্বাচন করছিলাম। শেষে হিসাব করার ইচ্ছা হল। সামনে গিয়ে দেখি বাছাইকৃত বইগুলোর মধ্যে একটি বই 'আল-ইন্তিছার লিআহলিল হাদীছ' অর্থাৎ 'আহলেহাদীছদের বিজয়ের স্বরূপ' এক ভাই হাতে নিয়ে দেখছেন। আমাকে আরবীতে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নিবেন? কোন্ দেশ থেকে এসেছেন? বাংলাদেশ থেকে। আপনি কি আহলেহাদীছ? বললাম, অবশ্যই। বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সাথে সাথে বললেন, বইগুলো সব আমার পক্ষ থেকে উপহার। আপনি দাম দিবেন না। ইতিমধ্যে পাশ থেকে ভাই আলী রেযা ও সাজীদ আমার যাওয়ার কারণ ও পরিচয় দেন। এরপর সংক্ষেপ কিছু কথা। নাম খালিদ আল ওয়ালীদ। কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র। আগ্রহের সাথে তার মোবাইল নম্বরটা আমার মোবাইলে দুই বার সেভ করে দিলেন। কারণ যেন ভুলে না যাই। বুঝলাম আহলেহাদীছদের মর্যাদা সর্বত্রই কত বেশী!

এবার দিয়ারার পথে। ভাই আতিফের কাছে অনেকে অপেক্ষা করছেন। আমাদের একটু দেরী হয়ে গেছে। অবশেষে পৌঁছলাম। ইতিমধ্যে অন্যরা আবুধাবী ঘুরে রাত্রে দিয়ারাতে পৌঁছে গেছেন পীস টিভির গাড়ীতে। আমি তাদেরকে নিয়ে আতিফ ভাইয়ের নিকট আসলাম। তবে সবাই নন। আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, হাফেয আখতার বললেন, আমরা আবুধাবীতে না গিয়ে এখানে আসাই ভাল ছিল। কিন্তু আমরা সময় দিতে পারলাম না। আতীফ ভাইসহ তার আমন্ত্রিত ভাইয়েরা আমাদের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। অনেক দূর থেকে এসেছিলেন পাকিস্তানী ভাই ওছমান। তার সাথে আমি বেশ সময় দিলাম। অন্যরা চলে গেলেন। তাদেরকে প্রত্যেকের জন্য উন্নত মানের খানা সাথে দিয়ে দিলেন। আরো হাদিয়া দিলেন আতর। প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা হেঁটে পার্কিং পর্যন্ত তাদের বিদায় দিলেন। শেষে আতীফ ভাই বললেন, পৃথিবীতে আর যদি সাক্ষাৎ নাও হয় তবে আল্লাহ যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে সাক্ষাৎ করান। চোখে অশ্রু টলমল করছে!

আমার রওনা হতে দেরী হল। ওছমান ভাই আমাকে হোটেলে রেখে আসার কথা জানালেন। রাত্রি প্রায় সাড়ে ১২টা। তখন হোটেলের উদ্দেশ্যে বের হলাম। কিন্তু বিদায় কি সহজ। মাত্র ২/৩ সপ্তাহে কত আপনই না হয়ে গেছেন এই ভাইয়েরা। আলী রেযা ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে গেল। পাশে বসা সাজীদ ভাই। তারও অবস্থা একই। কিন্তু বিদায় বড় নিষ্ঠুর। কিছুই মানে না। সবকিছুই তার জন্য ছাড়তে হয়। অতঃপর রাত্রি দেড়টার দিকে পৌঁছলাম হোটেলে। এবার ওছমান ভাইকে বিদায় জানিয়ে শেষ করলাম দুবাইয়ের সফর।

পরের দিন ১৭ মার্চ। সকাল ৯টার দিকে বের হলাম। আমরা দুবাইকে বিদায় জানিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে বিমানে চেপে বসলাম। ৪ ঘণ্টার সফর শেষে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে নামলাম রাত্রি সাড়ে ৮টায়। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে দেখলাম সংগঠনের অনেক ভাই খুশির ঝিলিক নিয়ে আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য উপস্থিত। রাজশাহী থেকে গাড়ী নিয়ে গেছেন যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুর রাকীব, সোনামণি সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছোটভাই হাফেয মুকাররম। এছাড়া ঢাকা থেকে এসেছেন আন্দোলনের অর্থ সম্পাদক কাযী হারুন, ঢাকা যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক ফযলুল হক সহ আরো অনেকে। এদিকে আমীরে জামা'আত আমাদেরকে বিসিভ করার জন্য অপেক্ষায় আছেন। অবশেষে আমরা পৌঁছলাম রাত পৌনে চারটায়। তখনও তিনি জেগে ছিলেন। গাড়ি থেকে নামতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আর বললেন, আমি আল্লাহর কাছে বলেছি, আল্লাহ তুমি সসম্মানে সুস্থ শরীরে পৌঁছে দিও। আমরা মসজিদে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলাম। তিনি আমাদের বিদায় জানালেন।

আমীরে জামা'আতের মাধ্যম দিয়ে পীস টিভির সন্ধান পাওয়ায় আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদেরকে। বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট ছহীহ দাওয়াত পৌঁছানোর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য পীস টিভি কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। অনেক দেশীয় ভাই আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। এটা ছিল কেবলই সংগঠনের বরকত। তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ পীস টিভির সাথে জড়িত সকল ভাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!!

লেখক : কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ১৯৯৬-এ প্রদত্ত আমীরে জামা'আতের ভাষণ

[২৫শে অক্টোবর '৯৬ শুক্রবার সকালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রথম দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের প্রদত্ত ভাষণ। অসুখের তীব্রতায় আসতে পারবেন না ভেবে প্রথমে তিনি ভাষণটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। পরে কিছুটা সুস্থবোধ করলে চিকিৎসকের অনুমতিক্রমে সম্মেলনের দিন সকালে বিমানযোগে ঢাকা থেকে রাজশাহী আসেন। ঐদিন হাযারো কর্মীর মুহুর্মুহু তাকবীরধ্বনি ও আনন্দাশ্রুতে বিমানবন্দরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। অতঃপর তিনি সরাসরি সম্মেলন মঞ্চে এসে ভাষণটির অংশবিশেষ পাঠ করেন]

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

হাম্দ-ছানা ও তাসলীমবাদ আপনারা সকলে আমার প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ভালবাসা গ্রহণ করুন। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর দীর্ঘ পথপরিক্রমায় স্বতন্ত্রভাবে এবার প্রথম নতুন ও পুরাতন কর্মীদের কেন্দ্রীয় সম্মেলন হতে যাচ্ছে দেখে আমি যারপরনেই আনন্দিত। আশা করি এর মাধ্যমে পারস্পরিক মহব্বতের বন্ধন আরো মযবুত হবে এবং আন্দোলনের গতি আরও যোরদার হবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আল্লাহ পাকের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

প্রিয় সাথীগণ!

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এক কথায় ধ্বংসের দিকে দ্রুত ধাবমান একটি উল্কাপিণ্ডের ন্যায়। সভ্যতা, মানবতা ও ন্যায়বিচার বর্তমানে ভূলুণ্ঠিত। অন্যায়কারীদের দোর্দণ্ড প্রতাপে ন্যায়পন্থীরা আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক প্রেক্ষাপট সৃষ্টির মূল কারণ একটাই। আর তা হ'ল আমাদের 'ঈমানী দুর্বলতা'। কেননা প্রত্যেক মানুষ এক একটি বিশ্বাসে ভর করে এ পৃথিবীতে চলাফেরা করে। স্ব স্ব লালিত বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ তার জীবন পথে পদচারণা করে। এই বিশ্বাসের পরিবর্তনের মাধ্যমেই একটি সমাজের সার্বিক অবস্থা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে এ বিশ্বাস অর্থাৎ ঈমানী ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। সহজ-সরল ধর্মভীরু এই মুসলিম দেশটির ঈশান কোণে আবির্ভূত হয়েছে দেশী-বিদেশী সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবীদের কুটিল চক্রান্তের গাঢ় মেঘ, যা ঘনঘটার আকারে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় ইতিমধ্যেই উন্মত্ত হস্তির মত সমাজ জীবনকে পর্যুদস্ত করতে শুরু করেছে। আল্লাহ ও আখেরাতের উপরে বিশ্বাসের যে গভীর অনুভূতি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিশ্বের উন্নত সেরা সভ্য মানুষে পরিণত করেছিল; শত অভাবের তাড়নায়ও যাদের দ্বারা কোন অন্যায় আচরণ সম্ভব ছিল না। তারাই আজ বস্তুবাদী দুনিয়াসর্বস্ব মতবাদে বিভ্রান্ত হয়ে নৈতিকতাহীন পশুতে পরিণত হতে চলেছে। জ্বলন্ত অঙ্গারে আত্মাহুতি দানকারী উড়ন্ত পতঙ্গ যেমন নিজের আসন্ন ধ্বংসকে নিশ্চিত জেনেও নিঃসংকোচে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে; ঈমানহীন দুনিয়াদার মানুষও তেমনি ভোগবাদী আদর্শের মায়া মরীচিকার পিছনে ছুটে কামনা-বাসনার জ্বলন্ত অঙ্গারে নিজেদের ধ্বংস নিশ্চিত জেনেও সেদিকেই দ্রুতবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে এদের সংখ্যা বাড়ছে। সমাজের শাসনযন্ত্র হতে শুরু করে নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষও ভোগবাদী বিশ্বাসের রাহুগ্রাসে ক্রমেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে।

প্রাণপ্রিয় সাথীগণ!

আল্লাহপাক মানুষকে এ পৃথিবীর যে ভূখণ্ডে সৃষ্টি করেছেন, সে ভূখণ্ডে বসবাসরত মানবগোষ্ঠির জন্য তার উপর বিশেষ কিছু গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। বাংলাদেশের এই সবুজ ভূখণ্ডের মানুষগুলিকে আল্লাহমুখী করে সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের। বিশেষ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের। কেননা আল্লাহপাক আমাদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করে এরশাদ করেছেন : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা মানুষকে ন্যায়ের আদেশ করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*।

উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে আমরা নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হব ও সমাজ বিপর্যস্ত হবে। বর্তমানে মুসলিম সমাজ তার দায়িত্ব অনেকাংশে ভুলতে বসেছে এবং পাশাপাশি ভোগবাদী আদর্শ ও সন্দেহবাদী বুদ্ধিজীবীদের সৃষ্ট ধূম্রজালে নিজেদেরকে জড়িয়ে ফেলেছে। আমরা মনে করি এদেশে বর্তমানে বস্তুগত দারিদ্র্যের চাইতে বিশ্বাসগত দারিদ্র্যই প্রকট আকার ধারণ করেছে। ঈমানের দারিদ্র্য হতে তাই আমাদেরকে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে। স্মরণ করুন আল্লাহ্‌র বাণী- بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا–وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى 'বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাক, অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও চিরস্থায়ী' *(আ'লা ৮৭/১৬)*।

ভোগবাদী আদর্শ মানুষকে কখনোই অল্পে তুষ্ট হতে দেয় না। 'আরো চাই, আরো চাই'–এই অধিক পাওয়ার তাড়না তাকে কবরে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাড়া করে ফেরে। স্মরণ করুন আল্লাহ্‌র অহি- أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ – حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ 'অধিক পাওয়ার প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (আখেরাত থেকে) গাফেল করে ফেলেছে। যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানসমূহে পৌঁছে যাও' *(তাকাছুর ১০২/১-২)*। মূলতঃ ইসলাম ও ইসলাম বিরোধী আদর্শের মধ্যে মৌলিক দ্বন্দ্ব এখানেই। ইসলাম তার বিশ্বাসীদেরকে আখেরাতমুখী করে গড়ে তোলে। আল্লাহ্‌র নিকটে জওয়াবদিহিতার তীব্র দায়িত্বানুভূতি মুসলমানের কথা ও কর্মকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করে তোলে। আর তাই মুসলমানের সমাজ হয়ে উঠে পৃথিবীর সর্বাধিক সুখী ও শান্তিময় সমাজ। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসহীন ব্যক্তি চরমভাবে বস্তুবাদী হয়ে উঠে এবং তার

চরম ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করতে গিয়ে এ পৃথিবীকে পরিণত করে অনাচার ও অশান্তির এক দুঃসহ কারাগারে। ভোগের প্রতিযোগিতায় মত্ত মানুষ নেমে যায় পশুত্বের নিম্নতম স্তরে। ন্যায়-অন্যায় সুনীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি কথাগুলি তাদের কাছে হয়ে উঠে নিতান্তই কথার কথা। ধর্মগ্রন্থ কিংবা দেশের শাসন সংবিধানে যত সুন্দর কথাই লেখা থাক না কেন, সেগুলি তাদের কাছে শিল্পী কণ্ঠের সুন্দর কোরাসের মতই শুনায়। হৃদয়ে যা রেখাপাত করে না। কর্ম জীবনে যার প্রতিফলন ঘটে না। স্মরণ করুন পবিত্র কুরআনের সেই সুন্দরতম বাণীচিত্র : وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 'আমরা সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও ইনসান। তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু বুঝতে চেষ্টা করে না। তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না। তাদের কান রয়েছে কিন্তু তারা তা দ্বারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তার চাইতেও পথভ্রষ্ট। তারা হল গাফেল' *(আ'রাফ ৭/১৭৯)*।

বাংলাদেশে আমরা অধিকাংশ মুসলমান। এদেশের শাসনযন্ত্রের মালিকানা মুসলমানদেরই হাতে। অথচ এদেশের মানুষ অন্যান্য দেশের তুলনায় বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। এর মৌলিক কারণ হিসাবে আমরা আমাদের ঈমানের দুর্বলতাকেই দায়ী করি। এই দুর্বলতা সাধারণ জনগোষ্ঠীর চাইতে শাসক সম্প্রদায়ের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব দানকারী লোকদের মধ্যেই বেশী। আর তাদেরই প্রভাবে বরং তাদেরই চক্রান্তে আজ সমাজের মেরুদণ্ড যুবশক্তি নৈতিক দিক দিয়ে দেওলিয়াত্বের পর্যায়ে নেমে যাচ্ছে। আজকের শিক্ষিত যুবসমাজ বিভিন্ন দলের লেজুড় ও আর্মস ক্যাডার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নেতৃবৃন্দের অদূরদর্শিতা অথবা অনীহার কারণেই এদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে কোটির অংক ছাড়িয়ে গেছে। আর এদেরই বেকারত্বের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ের চতুর নেতারা। উপরন্তু নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষার ফলে শিক্ষিত তরুণ সমাজ ক্রমেই ভোগবাদী হয়ে উঠছে। চাকুরী-বাকুরীর বিভিন্নস্তরে এমনকি চিকিৎসার ন্যায় জনসেবামূলক চাকুরীতে গিয়েও এরা শোষকের মূর্তি নিয়ে জনগণের সামনে আবির্ভূত হচ্ছে। ফলে কি শিক্ষিত বেকার কি কর্মজীবী বা উচ্চ পর্যায়ের চাকুরীজীবি বা শাসনযন্ত্রের পরিচালক সকলেই চরিত্রগত দিক দিয়ে হয়ে উঠেছে একেকজন ভোগবাদী শোষক। ইতিমধ্যেই মাধ্যমিক পর্যায়ে ইসলামিয়াত বিষয়ে ১০০ নম্বরকে ৫০ নম্বরে পরিণত করার সরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, যাতে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষীণ আলোটুকুও তরুণ ছাত্রদের অন্তর থেকে মুছে যায়। ডঃ কুদরত-ই-খুদা-এর নাস্তিক্যবাদী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে আল্লাহভীরু বাংলাদেশী ছাত্র সমাজের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার অপতৎপরতা চলছে। এমনকি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেও পার্শ্ববর্তী ইসলামবৈরী রাষ্ট্রটির ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও মতি-মর্যির নিকটে সমর্পণ করার সমস্ত আলামত ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে। উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের ও সাথীদের করণীয় কি হবে?

আমি মনে করি আমাদের প্রথম কর্তব্য হবে স্ব স্ব ঈমানকে মযবুত করা। যে ঈমানে প্রাচীন বা আধুনিক কোনরূপ সন্দেহবাদের সংমিশ্রণ থাকবে না। আধুনিক বস্তুবাদী আদর্শ যে ঈমানকে গ্রাস করবে না। ইসলামের নামে সৃষ্ট যুগে যুগে বিভিন্ন তরীকা ও মাযহাবী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ধূম্রজাল যে ঈমানের স্বচ্ছ নীল আকাশকে মেঘাচ্ছন্ন করবে না।

২য় : আমাদেরকে নিজ নিজ কর্মজীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। কারণ ইসলাম মূলতঃ কর্মের নাম, কেবলমাত্র বিশ্বাসের নাম নয়। ঈমান অনুযায়ী আমল যিনি করেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে মুসলিম। আর এই আমলের সঠিক দিক-নির্দেশিকা হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থের কারণে পরবর্তীকালে সৃষ্ট বিভিন্ন মাযহাবী ব্যাখ্যার গোলকধাঁধায় পড়ে মুসলিম জাতি আজ শতধাবিভক্ত ও পরস্পরে শত্রুভাবাপন্ন। এমনকি খোদ আমরাই আজ স্বগোত্রীয় হিংসার শিকারে পরিণত হয়েছি। এই অবস্থার আশু নিরসনের জন্য আমাদেরকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যেতে হবে। ইসলামের নামে বা আধুনিকতার নামে সৃষ্ট যাবতীয় মাযহাব, মতবাদ, তরীকা ও ইজম হতে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহ প্রেরিত অহির বিধানের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আমাদের আমলী যিন্দেগীকে বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে নিশ্ছিদ্র দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। ছাত্র জীবনে হৌক আর কর্ম জীবনে হৌক, ব্যক্তি জীবনে হৌক আর সমাজ জীবনে হৌক, সর্বাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহের সনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে নিজেকে উত্তম দৃষ্টান্ত রূপে পেশ করতে হবে। শ্লোগান ও মিছিল দিয়ে নয়, নিজের আচরণ দিয়ে বাতিলকে সর্বত্র মুকাবিলা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ)-এর ও তাঁর অতুলনীয় সাথীদের আচরণকে মনে রাখুন– مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল ও তাঁর সাথীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ও আপোষে রহমদিল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সিজদারত দেখবেন। তাদের কপোলদেশে দেখবেন সিজদার চিহ্ন' *(ফাৎহ ৪৮/২৯)*। বাতিলের সঙ্গে আপোষ করে নয় বরং বাতিলকে প্রতিরোধ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে হককে বিজয়ী করতে হবে। মনে রাখুন আল্লাহ্‌র বাণী- هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি স্বীয় রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্ম সহকারে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে সকল ধর্মের উপরে তিনি বিজয়ী করেন। যদিও মুশরিকরা তা পসন্দ করে না' *(ছফ ৬১/৯)*।

পিতা ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শ্রবণ করুন– إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ 'আমরা তোমাদের সাথে এবং যাদের তোমরা দাসত্ব কর, তাদের সাথে বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করলাম। এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ বিঘোষিত হ'ল চিরকালের জন্য, যতক্ষণ না তোমরা কেবলমাত্র একক আল্লাহর উপরে ঈমান আনবে' *(মুমতাহিনা ৬০/৪)*। শ্রবণ করুন আমাদের রাসূলের সিদ্ধান্তকারী চূড়ান্ত জওয়াব মুশরিক নেতাদের আপোষ প্রস্তাবের

বিরুদ্ধে– قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ– لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ – وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ – وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ – وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ– لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 'হে অবিশ্বাসীগণ! আমি তার ইবাদত করি না, তোমরা যার ইবাদত কর এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও আমি যাঁর ইবাদত করি।.. তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য' *(কাফেরূণ ১০৯/১-৬)*।

৩য় : আহলেহাদীছ আন্দোলনের সকল পর্যায়ের মুরব্বী যুবক মহিলা ও শিশুদেরকে একই আন্দোলনের সাথী হিসাবে ভাবতে হবে। সকলকে একই লক্ষ্যপথের যাত্রী হিসাবে পারস্পরিক সহযোগিতার কাঠামোকে সুদৃঢ় করতে হবে। প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ-এর সত্যকে সামনে নিয়ে নির্ভীক চিত্তে এগিয়ে যেতে হবে। বাংলার যমীনে আমাদের সমাজ বিপ্লবের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হবে।

৪র্থ : প্রত্যেককেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দাওয়াতের ফরয দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আগামী দিনের সোনালী ভবিষ্যতের রূপকার হিসাবে যুবসমাজকে নতুনভাবে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। আমাদের এই মাতৃভূমিকে সাক্ষাত ধ্বংসের দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক নির্ভেজাল ইসলামের দিকে সকলকে ফিরে আসতে হবে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ব্যতীত যার কোন বিকল্প নেই। তাই বিগত দিনের যে কোন সময়ের চাইতে বর্তমান সময়ে আহলেহাদীছ আন্দোলনের গুরুত্ব সর্বাধিক। এই আন্দোলনই ফিরিয়ে আনতে পারে ইসলামের স্বচ্ছ সুন্দর আদি রূপ। আল-হেরা ও আল-মদীনার ফেলে আসা সেই নির্ভেজাল ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ও অন্যান্য সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

আমি আপনাদেরকে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সমাজ জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে খালেদ, তারেক, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, মূসা বিন নুছাইর ও কুতাইবা বিন মুসলিমের মত দিগ্বিজয়ী বীরের বেশে আবির্ভূত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন আমীন!

দীর্ঘ অসুস্থতা ও চিকিৎসকের উপদেশ অগ্রাহ্য করে আপনাদের মহতী সম্মেলনে উপস্থিত হতে না পারায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। প্রধান অতিথির শূন্য চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আপনারা নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়বেন না, এটাই আমার কামনা। আমার স্বপ্ন জগতের প্রিয়তম আকাংখার প্রথম রূপকার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র প্রাণপ্রিয় সাথীদেরকে স্বচক্ষে দেখতে না পেয়ে আমি দারুণভাবে দুঃখিত ও আন্তরিকভাবে ব্যথিত।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের স্বার্থে প্রয়োজন মনে করলে আল্লাহ যেন আমাকে দ্রুত সুস্থতা দান করেন এবং এই দীর্ঘ রোগ ভোগকে আমার গুনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে কবুল করে নেন। আপনারা সকলে আমার জন্য প্রাণ খুলে সেই দো'আ করবেন। রাজধানীর একপ্রান্তের গৃহকোণে অবস্থিত রোগশয্যা থেকে আমি সম্মেলনের সফলতার জন্য আন্তরিকভাবে দো'আ করছি এবং আপনাদেরকে আমার অন্তরখোলা সালাম জানাচ্ছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১
প্রেক্ষাপট ও প্রত্যাশা

-ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ

ভারতবর্ষে ইসলাম আগমনের সূচনা হয় রাসূল (ছা.)-এর জীবদ্দশাতেই। অতঃপর খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ও তৎপরবর্তী পর্যায়ে আরব বণিক, ছাহাবায়ে কেরাম এবং ওলামায়ে দ্বীনের মাধ্যমে তা নানাভাবে বিকশিত হয়ে ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে রাজনৈতিক নানা পট পরিবর্তনের ফলে এদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে বহুমুখী বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। এই বিভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলই সময়ের ব্যবধানে ভারতবর্ষের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মুসলমানের অন্তরে প্রকৃত ধর্মের স্থান দখল করে নেয়। ফলশ্রুতিতে এদেশের জনগণের মধ্যে কেউ মাযহাবপন্থী, কেউ পীরপন্থী, কেউ কবরপন্থী, কেউ শিরক ও বিদ'আতপন্থী, আবার কেউ কেউ শী'আ বা কাদিয়ানীপন্থী হয়েও নিজেকে স্বগর্বে মুসলমান পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে নানা প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করেও নগণ্য কিছু আলেম হক্ব বিমুখ বিভ্রান্ত নিরীহ মুসলমানের মাঝে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। যুগে যুগে এঁরাই 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হয়ে এসেছেন, আজও হচ্ছেন। জেনে রাখা ভাল আহলেহাদীছ কোন সম্প্রদায়ের নাম নয়। যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসারী কেবল তিনিই কেবল এই নামে নিজেকে অভিহিত করতে পারেন। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন সেটিই মূলতঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন।

ভারতবর্ষে আহলেহাদীছ আন্দোলনের ইতিহাস সুপ্রাচীন। এ আন্দোলন এদেশে মূলতঃ একটি ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে পরিচিত হলেও সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এ আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশ খেদাও আন্দোলনে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অবদান অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও তাঁর শিষ্যদের দ্বারা গঠিত ফরায়েযী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদেশে বৃটিশ রাজত্বকে তিনি এবং তাঁর সাথীরা ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং ইংরেজ শাসনাধীন এদেশকে তিনি 'দারুল হার্ব' বলে মনে করতেন। যার ফলে তাঁর আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ধারিত হয় এদেশ থেকে বৃটিশ বিতাড়নের মাধ্যমে 'দারুল হারব'কে 'দারুল ইসলামে' পরিণত করা। যা ছিল বৃটিশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য রাজনৈতিক পদক্ষেপ। অতঃপর বারাসাতের সৈয়দ নেছার আলী ওরফে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)-এর বাঁশের কেল্লার কথা বলা যেতে পারে। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে তিতুমীর আপোষহীন ভূমিকা সর্বজনবিদিত। অতঃপর মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব পরিচালিত ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের কথা বলা যেতে পারে, যা এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল উদ্দেশ্যমূলকভাবে 'ওয়াহ্হাবী আন্দোলন' বলে টিটকারী করে থাকে। এ আন্দোলনও ধর্মীয় সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমনিভাবে বৃটিশ বিরোধী সর্বাত্মক

আন্দোলনের ফলেই ভারতবর্ষ একপর্যায় বিদেশী দখলদারদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করে।

বৃটিশ বেণিয়ারা এদেশ থেকে চলে গেল ঠিকই, কিন্তু রেখে গেল এমন কিছু নিয়ম-কানুন ও সংস্কৃতি, যার দ্বারা এদেশের আপামর জনসাধারণ আজও পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে এদেশীয় নরপতিদের দ্বারা নিষ্পেষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বৃটিশরা এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মীয় ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার যে আমূল পরিবর্তন এনেছিল, যা ছিল ভূতপূর্ব ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফলে এক শ্রেণীর প্রগতিবাদী ধর্মবিমুখ তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ সহজেই সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে আনীত ঐ পদ্ধতিকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং এর বিপরীত তথা দীর্ঘদিনের পুরাতন ব্যবস্থাকে কখনো পরোক্ষভাবে আবার কখনো প্রত্যক্ষভাবে এড়িয়ে যায় বা বিরোধিতা করে থাকে। যে কারণে ঐ সব মুসলমানের সন্তানদের চিন্তা-চেতনা থেকে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। অপর দিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অল্প শিক্ষিত আলেমদের নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাবের কারণে অধিকাংশ মুসলমানের কেউ মাযহাব পন্থী, কেউ পীর বা তরীক্বা পন্থী পরিচয়ে আপোষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এমনকি ছালাত-ছিয়ামের মত নিয়মিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে এবাদত করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বৃটিশের রেখে যাওয়া নিয়মের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে এদেশের নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা কার্যতঃ ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, কাটাকাটি, রক্তপাতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে এদেশের মুসলমানদের মধ্যে এই সেক্যুলার ও পপুলার গোষ্ঠী দু'টি অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে আপন আপন অবস্থানে থেকে কাজ করে যাচ্ছে। এরই মাঝে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সেক্যুলার বা পপুলার কোন পন্থার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিরপেক্ষভাবে অনুসরণ করে এসেছে। এঁরাই হল প্রকৃত পক্ষে আহলেহাদীছ এবং এঁদের পরিচালিত আন্দোলনই প্রকৃত আহলেহাদীছ আন্দোলন।

ভারতবর্ষে স্বতন্ত্র পরিচয়ে আহলেহাদীছরা সর্বপ্রথম সাংগঠনিক পরিচয় বহন করে ১৮৯৫ সাল থেকে। উক্ত সংগঠনের নাম ছিল **'জামাআতে গোরাবায়ে আহলেহাদীছ'**, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন আপোষহীন সংগ্রামী সিপাহসালার মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব দেহলভী (১৮৬৬-১৯৩৩)। অতঃপর বিশিষ্ট মুনাযের ও প্রসিদ্ধ আলেম মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী, শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আব্দুর রহমান মুবারকপুরীসহ বেশ কিছু দুঃসাহসী আলেমের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৯০৬ সালে একটি বড় ধরনের আহলেহাদীছ 'কনফারেন্স'-এর ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত কনফারেন্সে উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে **'অল-ইন্ডিয়া আহলে হাদীছ কনফারেন্স'** নামে একটি সর্বভারতীয় আহলেহাদীছ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। যার প্রথম সভাপতি ছিলেন হাফেয আব্দুল্লাহ গাযীপুরী (১৮৪৪-১৯১৯)। এর ঠিক ৪০ বছরের মাথায় মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহ.) (১৯০০-১৯৬০) প্রতিষ্ঠা করেন 'নিখিল **বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিস'** নামে একটি সংগঠন। এ আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী (রহ.), মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (১৮৮৮-১৯৫৮), মাওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মাওলানা আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২), আবুল মনসুর আহমাদ প্রমুখ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দ। যদিও তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। এই 'নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিস'ই কালের পরিক্রমায় ভৌগলিক পট পরিবর্তনের ফলে 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদিস' নাম ধারণ করে।

যতদিন মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহ.) জমঈয়তে আহলে হাদিসের দায়িত্বে ছিলেন, কার্যতঃ ততদিন পর্যন্ত জমঈয়ত মূল আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত করেছিল। এরপর থেকে যত দিন অতিবাহিত হয়েছে, জমঈয়ত তার মূল আদর্শ থেকে তত দূরে সরে গিয়েছে। মূল সংগঠনের এই করুণ অবস্থায় কিছু মুরব্বী পুরাতন মোহাব্বতে জমঈতের সঙ্গে চোখ-কান বুঁজে থাকলেও তরুণ সমাজ ঐ মরা নদী নিয়ে কোন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না। ফলে তারা দিন দিন আপন ঘর ছেড়ে পরের ঘরে গিয়ে নিজের মেধা, সময়, শ্রম এমনকি অবলীলাক্রমে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে শুরু করে। এমত পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিশেষ করে আহলেহাদীছ ঘরের মেধাবী সন্তানদের ঘরে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেন একটি যুব সংগঠন, যার নাম **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**। সাথে সাথে সারা বাংলাদেশে বিশেষ করে আহলেহাদীছ সমাজে অন্য রকম একটা সাড়া পড়ে গেল। দু'দিন আগেও যে পিতা তার সন্তানকে ছালাত আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করেও মসজিদমুখী করতে ব্যর্থ হয়েছেন, আজ 'যুবসংঘে'র ছেলেদের সংস্পর্শে এসে সে শুধু নিজেই ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদে যাচ্ছে না, অন্যকেও নিয়মিত ছালাত আদায়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শিরক ও বিদ'আত থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুসরণের দাওয়াত দিচ্ছে। যে আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান দু'দিন আগেও নেশা করে, সিনেমা দেখে, অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপ করে সময় অতিবাহিত করতো, সেই আহলেহাদীছ ঘরের সন্তান আজ দেশের প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতী আমলের বিরুদ্ধে, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী নীতি ও কর্মের বিরুদ্ধে স্বোচ্চার হয়ে উঠল। এমনিভাবে দিনে দিনে পথভোলা আহলেহাদীছ ঘরের বিচ্ছিন্ন সন্তানেরা সঠিক পথের দিশা পেয়ে নিজের জীবন পর্যন্ত আল্লাহ্র রাহে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ অবস্থানে পৌঁছতে এ সংগঠনকে পার হতে হয়েছে বহু চড়াই-উৎরাই। তবু বাংলার বুকে এ সংগঠন তার হক্ব প্রসারের আন্দোলনকে কখনই স্তিমিত হতে দেয়নি। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

আহলেহাদীছ যুবসংঘের আছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। রয়েছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে নির্ধারিত পাঁচটি মূলনীতি এবং যুগোপযোগী চারদফা কর্মসূচী। এছাড়াও সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আছে চারটি কর্মীদের স্তর এবং চারটি সাংগঠনিক স্তর। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আজও পর্যন্ত আহলেহাদীছ যুবসংঘ তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, মূলনীতি এবং কর্মসূচীর উপর অবিচল আস্থা নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

আহলেহাদীছ যুবসংঘের কর্মীদের চারটি স্তরের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরের সদস্যকেই বলা হয় 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য'। একজন যুবককে সংগঠনের 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হতে গেলে, তাকে নৈতিক, ঈমানী, জ্ঞান ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে

উন্নীত হতে হয়। ইচ্ছা করলেই সংগঠনের যেকোন সদস্য ঐ মানে উন্নীত হতে পারে না। এক কথায় এটি সংগঠনের কর্মীদের সর্বোচ্চ মান। ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে অত্র সংগঠন বহু যুবককে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় উক্ত মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

যেহেতু সংগঠনটি বয়সভিত্তিক ক্যাডারে বিভক্ত হয়ে পরিচালিত হচ্ছে, সেহেতু বয়স বৃদ্ধির কারণে সাংগঠনিক বাধ্যবাধকতায় অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইকে অত্র সংগঠনের গণ্ডি থেকে ঊর্ধ্বতন সংগঠনে প্রবেশ করতে হয়েছে। যাঁদের অনেকেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মূল সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আজও পর্যন্ত দ্বীনের কাজে সম্পৃক্ত রেখে নিজেদেরকে হক্বের পথে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। আবার অনেকের সে সৌভাগ্য হয়নি। কারণ ইতোমধ্যে এ সংগঠনটির উপর দিয়ে নানা রকম ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে। সে কারণে অনেকে দুর্বল ঈমানের পরিচয় দিয়ে, অনেকে জাগতিক প্রলোভনে পড়ে, অনেকে নেতৃত্বের প্রতি অযথা অভিমান করে, আবার অনেকে সংগঠনের মূল নীতি-আদর্শ পরিবর্তনের অযৌক্তিক দাবী তুলে সংগঠন থেকে দূরে সরে গিয়েছেন। আবার অনেকেই চিরতরে ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহ্র দরবারে পাড়ি জমিয়েছেন। তারপরও আহলেহাদীছ যুবসংঘ তার প্রতিষ্ঠিত নীতি-আদর্শের উপরে দৃঢ় থেকে কাঙ্খিত গতিতে না হলেও মহান আল্লাহ্র অশেষ রহমতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে ২০০৫ সালে একটি কুচক্রী মহল রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর সওয়ার হয়ে বাংলার বুক থেকে এই ক্ষুদ্র জামা'আতটিকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে জান্নাতকামী কিছু নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর পাহাড়সম সুদৃঢ় ঈমানী মনোবল, হক্বপন্থী জনসাধারণের প্রাণখোলা দোয়া, সর্বোপরি মহান আল্লাহ্র খাস রহমতে আহলেহাদীছ আন্দোলন আজও বাংলার মাটিতে সগৌরবে মাথা উঁচু করে পূর্বের তুলনায় আরও দুর্বার গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আশা করি যদি সংগঠনটি তার নীতি-আদর্শের উপর টিকে থাকে, তবে মহান আল্লাহ সামনে-পেছনের, ডাইনে-বায়ের সকল প্রকার চক্রান্তকে নস্যাৎ করে হক্বের এ আন্দোলনকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জারি রাখবেন ইনশাআল্লাহ।

গঠনতান্ত্রিক নিয়মে যে সকল তরুণ ভাইয়েরা অত্র সংগঠনের সর্বোচ্চ মানের কর্মী হিসাবে চলমান দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তাঁদের নিয়ে প্রতি বছরই সংগঠনের বিশেষ প্রয়োজনে এক বা একাধিক 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন' হয়ে থাকে। যেখানে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট এজেন্ডার উপরে আলোচনা, পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যেই কাউন্সিল সম্মেলনের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ থাকে। আবার প্রতি সেশনে সর্বস্তরের দায়িত্বশীল, কর্মী ও সুধীবৃন্দের সমন্বয়ে 'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন' একটি বড় আঙ্গিকে উন্মুক্ত আলোচনা হয়ে থাকে। যেখান পুরাতনদের মধ্যে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইয়েরা মূল সংগঠনের সাথে কোন না কোনভাবে সম্পৃক্ত হয়ে আছেন, শুধু তাঁরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন।

কিন্তু চলতি সেশনের দায়িত্বশীলবৃন্দ এবার একটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলনের আয়োজন করেছে। যেখানে সকল পুরাতন 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' ভাইদের দাওয়াত করার মাধ্যমে নতুন-পুরাতন সহযোদ্ধাদের এক অসাধারণ মেলবন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে কখনও আয়োজিত হয়নি বলে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র জন্য এটি এক ঐতিহাসিক সম্মেলন হিসাবে পরিগণিত হতে যাচ্ছে ইনশাআল্লাহ।

এই আয়োজন আমাদেরকে যেন এ কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে যাচ্ছে যে, সময়ের ব্যবধানে আমরা যেখানেই যাই না কেন, যত দূরেই থাকি না কেন আমাদেরকে আবার একদিন ফিরতেই হবে সেখানে যেখান থেকে আমাদের উত্থান ঘটেছিল। আমরা সকলেই এমন একটি আন্দোলনের সহযোদ্ধা ছিলাম এবং রয়েছি, যে আন্দোলন পৃথিবীর বুকে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করার জন্য সবচেয়ে বিশুদ্ধ আন্দোলন। যে আন্দোলনের একমাত্র ঠিকানা জান্নাতুল ফেরদাউস ইনশাআল্লাহ। অতএব এ আন্দোলন থেকে জীবনের কোন একটি অসতর্ক মুহূর্তেও বিচ্যুত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এত কিছুর মাঝেও আমাদেরকে যে কঠোর বাস্তবতা ব্যথাতুর করে তোলে তা হল আমাদের কিছু ভাইয়ের পদস্খলন। সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহর নিকটে এই প্রার্থনা করি, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল ভাইকে সকল প্রকার শয়তানী কুমন্ত্রনার উর্ধ্বে উঠে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে শামিল হওয়ার তাওফীক দাও'। প্রসঙ্গতঃ ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কাঁদা ছুড়াছুড়ি করে এমন কিছু বিভেদাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যা কখনই বাঞ্ছনীয় ছিল না। এরকম অনাকাঙ্খিত পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে যত কারণ বা যুক্তিই থাকুক না কেন এই মুহূর্তে অন্যকে দোষারোপ না করে বলব, এখন আবার সময় এসেছে– নিজেদের পারস্পরিক স্বার্থদ্বন্দ্ব পরিহার করে হক্বের এই আন্দোলনকে সম্মুখপানে এগিয়ে নেওয়ার, সত্য ও ন্যায়ের বিজয়বার্তা ঘোষণার জন্য আবার সেই পতাকা হাতে তুলে নেয়ার। আল্লাহর রজ্জুকে মযবুত হস্তে ধারণ করে বাতিলের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার নতুন অভিযাত্রার। যে সুযোগ ও সৌভাগ্য চাইলেই আল্লাহ সবার ভাগ্যে নছীব করেন না। তার জন্য আল্লাহ্র একান্ত রহমতের প্রয়োজন হয়। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন। আমীন!

পরিশেষে আমি নিশ্চিত যে, দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ তার সুনির্দিষ্ট নীতি-আদর্শের আলোকে শির্ক ও বিদআত অধ্যুষিত এই বাংলার জমিনে অহির যে দাওয়াতী নিশান বহন করে চলেছে, সে দাওয়াত যে বিশুদ্ধ দাওয়াত তাতে আমাদের কারোরই দ্বিমত নেই। তাই এ সম্মেলন থেকে আমাদের বুকভরা প্রত্যাশা, এই বিশুদ্ধ দাওয়াতের প্রতি আমাদের যে এক স্থায়ী ভালবাসা রয়েছে, নবীন-প্রবীণের এ মিলনমেলার মাধ্যমে সেটাই প্রমাণিত হোক। আর সত্যি বলতে কি জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তথা আমাদের যৌবনকাল যে সংগঠনের নিবিড় ছায়াতলে প্রতিপালিত হয়েছে সে সংগঠনের প্রতি আমাদের ভালবাসার টান বাস্তবিকঅর্থে কোনদিন ম্লান হতে পারে না। তাই আসুন, জাগতিক সকল ভেদাভেদ ভুলে আমাদের প্রাণপ্রিয় সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর এই দীপ্ত আলোকশিখাকে বাংলার প্রান্তরে প্রান্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই। আর এই প্রতিজ্ঞা বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য তথা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিল করি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সে তাওফীক দিন-আমীন॥

লেখক : কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

সাক্ষাৎকার

*['বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবে**'র এই স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন 'তাওহীদের ডাক'-এর পক্ষ থেকে **মুযাফ্ফর বিন মুহসিন ও নূরুল ইসলাম**]*

তাওহীদের ডাক : আমাদের জানামতে আপনিই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রীধারী। বিষয়টি নিঃসন্দেহে তখনকার প্রেক্ষাপটে স্পর্শকাতর ছিল। তা সত্ত্বেও এমন একটি বিষয়কে পিএইচ.ডির জন্য বেছে নেয়ার চিন্তা কিভাবে এসেছিল?

আমীরে জামা'আত : পিএইচ.ডি থিসিসের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-কে বেছে নেওয়ার আত্মিক প্রেরণা আমার মধ্যে হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি। এ আন্দোলনকে যখন থেকে জেনেছি তখন থেকেই বিষয়টি আমার অন্তরে স্থান করে নিয়েছিল। সুপ্ত এ প্রেরণা বাস্তবতার পাদপ্রদীপে আসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের পর পিএইচ.ডি করার বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময়। তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ডঃ আব্দুল বারীর একান্ত চাপ ছিল তাঁর চাচাজী মরহূম 'মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শীর জীবন ও কর্ম' বিষয়ে কাজ করি। এজন্য তিনি সুপারভাইজর হিসাবে প্রফেসর ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানীর নাম প্রস্তাব করেন। তাঁরা উভয়ে ছিলেন জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর যথাক্রমে সভাপতি ও সহ-সভাপতি। সে মোতাবেক কাগজ-পত্র তৈরী করি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জমা দেইনি। কেননা জীবনীমূলক গবেষণায় আমি আগ্রহ পাচ্ছিলাম না। বরং আদর্শের উপরে গবেষণা করাই ছিল আমার ইচ্ছা। আর সেজন্যেই আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বেছে নিয়েছিলাম এবং নতুনভাবে কাগজ-পত্র প্রস্তুত করি। এর উপরে ১৯৭৯ সালেই আমার প্রথম বই বের হয়, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন'? আমার একান্ত কামনা ছিল এই যে, এমন একটি বিষয়ে আমি পিএইচ.ডি করব, যেটা হবে নির্ভেজাল সত্যের দিক-নির্দেশক এবং যেটার উপর কাজ করা অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু এসে যায়, তাহ'লে যেন তার নেকীর বিনিময়ে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি। এরই মধ্যে কমনওয়েল্থ স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হ'ল এবং সেজন্য ইউজিসিতে বাছাই পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হ'ল। সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচ.ডির জন্য স্কলারশিপের আবেদন করতে পারবেন। আমি দরখাস্ত পাঠালাম। অতঃপর ১৯৮৪ সালে চূড়ান্ত নির্বাচনে আমি ১ম এবং চট্টগ্রামের আবুবকর রফীক ২য় হন। যিনি এখন চট্টগ্রাম বেসরকারী আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি। আমরা উত্তীর্ণ হ'লেও ঐ বছর কাউকে স্কলারশিপ দেওয়া হল না অজানা কোন কারণে। পরের বছর আমার বয়স ৩৫ হয়ে যাওয়ায় আর দরখাস্ত করতে পারিনি। তাই একই বিষয়বস্তু আমি ইউজিসিতে পেশ করি এবং সেখান থেকে বৃত্তি নিয়ে 'বিমক' ফেলো হিসাবে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'** শিরোনামে থিসিস করি। ১.১.১৯৮৬-তে অফিসিয়ালি কাজ শুরু করলেও প্রকৃত অর্থে কাজ শুরু হয় স্টাডি ট্যুর শেষে মার্চ '৮৯ থেকে। অতঃপর ১৯৯২-এর ২০শে আগষ্ট অনুষ্ঠিত সিণ্ডিকেট সভায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমার ডিগ্রী অনুমোদন করে।

তখনকার প্রেক্ষাপটে বিষয়টি স্পর্শকাতর ছিল বলা যায় এই কারণে যে, (১) আহলেহাদীছকে তখন আমভাবে বেদ্বীন, অজ্ঞ ও লা-মাযহাবী বলে গালি দেওয়া হ'ত (২) আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে প্রফেসরদের প্রায় সকলেই ছিলেন মাযহাবপন্থী এবং অনেকে ছিলেন আহলেহাদীছ বিদ্বেষী (৩) সাধারণ শিক্ষকদের কাছেও বিষয়টি ছিল নিতান্ত অনভিপ্রেত এবং অনেকের কাছে অপ্রয়োজনীয় (৪) আহলেহাদীছ শিক্ষকদের ভূমিকা ছিল নিরুৎসাহমূলক। কারণ এটি তাদের মতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট এবং এর ফলে অন্যদের সাথে দূরত্ব বেড়ে যাবে। তাছাড়া তাদের অনেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন (৫) ইতিহাসবিদ প্রফেসরগণ এটিকে উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে উদ্ভূত একটি সাময়িক আন্দোলন হিসাবে মনে করতেন এবং সে হিসাবে এর প্রতি যৎসামান্য আগ্রহ বোধ করতেন। অথচ আহলেহাদীছ হিসাবে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি যে, আহলেহাদীছ আন্দোলন হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। বাকী সবই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট এবং ভেজাল মিশ্রিত। আর আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সেটা প্রমাণ করা।

আরেকটু গোড়ার দিকে গেলে বলতে হয়, আমার এ আগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল আমার আব্বার মাধ্যমেই। তিনি ছিলেন দক্ষিণবঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তাঁর লিখিত 'আক্বীদায়ে মোহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ' ছোটকালেই আমার হৃদয়ে রেখাপাত করে। বিভিন্ন বাহাছ-মুনাযারায় মাযহাবী আলেম ও পীরদের অযৌক্তিক দলীল, হিংসাত্মক আচরণ ও মিথ্যাচার এবং হাস্যকর যুক্তি-তর্কসমূহের কাহিনী ছোট থেকেই আব্বার কাছে শুনেছি। অন্যান্যদের মত তিনি গোঁড়া ও সংকীর্ণচেতা ছিলেন না। লাবসা মাযহাবী মাদরাসায় শিক্ষকতা করে এবং মাযহাবী ব্যক্তির বাড়ীতে ২৭ বছর তাদের একান্ত আপনজন হিসাবে জীবন অতিবাহিত করা তাঁর উদারচিত্ততারই পরিচায়ক। অথচ তিনি তখন ছিলেন মাযহাবীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারায় আহলেহাদীছ পক্ষের নেতা। তাঁর আক্বীদা ছিল স্বচ্ছ, নিখাদ ও দৃঢ়। একই সাথে তাঁর আচরণ ছিল উদার, মমত্বপূর্ণ ও সমাজদরদী। আমি আমার মাদরাসা শিক্ষা জীবনের প্রথমদিকে কাকডাঙ্গায় ১০ বছর তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হিসাবে অত্যন্ত নিকট থেকে তাঁর আচার-আচরণ দেখার ও তা থেকে প্রভাবিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তাই আহলেহাদীছকে অন্যদের মত স্রেফ একটি ফের্কা হিসাবে আমি কখনোই মনে করিনি। ফলে ছোট থেকেই স্বপ্ন ছিল আল্লাহ সুযোগ দিলে এ আন্দোলনের গভীরে প্রবেশ করব এবং এর

প্রকৃত পরিচয় সমাজের নিকট তুলে ধরব। পিএইচ.ডি করার সুযোগটিকে আমি সেভাবেই গ্রহণ করি এবং একে আমার স্বপ্ন পূরণে আল্লাহ্র রহমত হিসাবে বরণ করে নেই।

তাওহীদের ডাক : বিষয়টি বেছে নেয়া আপনার জন্য কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল বা এর জন্য কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল কি না?

আমীরে জামা'আত : হ্যা! কাজটি নিঃসন্দেহে ছিল চ্যালেঞ্জিং। কিন্তু সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও সুযোগ আল্লাহ আমাকে দান করেছিলেন। বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এনেছেন অলৌকিকভাবে এবং উক্ত বিষয়ে ডিগ্রীটাও হয়েছে নিতান্তই আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। বরং আরো বলা যায়, শৈশব থেকেই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আমি আল্লাহ্র রহমতের ছোঁয়া পেয়েছি। সর্বদা আমি আমার লক্ষ্যে দৃঢ় থেকেছি। আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। ফলে বিরোধীদের শত বিরোধিতা ও বিনাশ সাধনের অপচেষ্টা আমাকে পথচ্যুত করতে পারেনি, *আলহামদুলিল্লাহ*। কখনো আত্মজীবনী লেখার সুযোগ পেলে সেসব কথা বলা যাবে। তবে আজ কেবল পিএইচ.ডি বিষয়েই বলব।

*

আহলেহাদীছ আন্দোলন হ'ল ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা একমাত্র নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলন। বাকী সবই পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট এবং ভেজাল মিশ্রিত। আর আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই ছিল সেটা প্রমাণ করা।

*

পিএইচ.ডি করতে গিয়ে আমার ১ম চ্যালেঞ্জ ছিল ব্যক্তি বনাম আদর্শ। যেটা আগেই বলেছি। অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার ছিল যে, এতে আমি স্বয়ং বিমক চেয়ারম্যানের বিরাগভাজনই শুধু হইনি বরং ধারাবাহিক ক্রোধ ও প্রতিশোধের শিকার হই।

২য় চ্যালেঞ্জ ছিল আমার বিভাগ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংশ্লিষ্টরা জানেন যে, থিসিসের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ঘাট পার হতে হয়। (ক) বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি (খ) ফ্যাকাল্টি (গ) এডভ্যান্সড স্টাডিজ কমিটি (ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল। এই চারটি কমিটির কোথাও গবেষক নিজে থাকেন না। ফলে ফ্যাকাল্টিতে গিয়ে আমার প্রস্তাব আটকে গেল। প্রশ্ন উঠল, আহলেহাদীছ আবার কি? এর উপরে পিএইচ.ডি কিসের? প্রায় বছরখানেক পড়ে থাকল। ঐখানে সদস্য থাকেন বিভাগীয় সিনিয়র শিক্ষক প্রতিনিধি এবং বাইরের কলেজের শিক্ষক প্রতিনিধি। একবার বাইরের কলেজের জনৈক শিক্ষক বিষয়টি কঠিনভাবে ধরেন এবং আমার বিভাগের প্রতিনিধির সাথে তাঁর তুমুল বিতণ্ডার পর শেষ পর্যন্ত বিষয়টি পাস হয়। তিনি বলেছিলেন, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মা কালী'র উপরে একজন মুসলমান পিএইচ.ডি করতে পারেন, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে আহলেহাদীছের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কেন পিএইচ.ডি হবে না? তাঁর একথার সদুত্তর কেউ দিতে পারেননি। ঐ প্রতিনিধিকে আমি আজও চিনি না। অন্য সদস্যদের মুখ থেকে তার এসব বক্তব্য জেনেছি। আল্লাহ তাঁকে ইহকাল ও পরকালে উত্তম জাযা দান করুন। পরবর্তীতে আমার বিরোধী সেই সিনিয়র কলিগকে উত্তম আচরণের মাধ্যমে এমন এক উত্তম প্রতিশোধের সুযোগ আল্লাহ আমাকে দিয়েছিলেন যে, তিনি এখন আমার হিতাকাংখীদের একজন। বরং হানাফী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্ত্রীর মৃত্যুর পর জানাযায় উপস্থিত মানুষকে কেবলমাত্র আমার খাতিরে কুলখানির বিদ'আতী অনুষ্ঠানের দাওয়াত দেননি এবং পরেও করেননি। যদিও এসব করার জন্য তাঁর উপর শিক্ষকদের যথেষ্ট চাপ ছিল।

৩. ১৯৮৪ সালে ইউজিসি'তে কমনওয়েল্থ স্কলারশিপের জন্য বাছাই পরীক্ষা। ইন্টারভিউ শুরুর ঘণ্টাখানেক আগে বিমক চেয়ারম্যানের কক্ষে ডাক পড়ল। সালাম ও কুশল বিনিময়ের পর বললেন, তুমি চাচাজী মরহূমের উপরে গবেষণা শিরোনাম ঠিক রেখে ইন্টারভিউ দাও। তাতে তোমার উত্তীর্ণ হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। কিন্তু 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র উপরে করলে উত্তীর্ণ হ'তে পারবে না। কারণ ইন্টারভিউ বোর্ডের ৯ জন সদস্যের মধ্যে আমি বাদে বাকী সবাই হানাফী এবং তার মধ্যে দু'জন বামপন্থী। কাফী ছাহেবকে সাহিত্যিক ও রাজনীতিক হিসাবে এবং আমার চাচাজী হিসাবে সবাই জানেন। অতএব সহজেই পাস হয়ে যাবে। আমার পরামর্শ হ'ল, আগে ডিগ্রীটা করে নাও, পরে আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর গবেষণা কর'। আমি বললাম, স্যার! ছাত্রজীবন থেকেই এ আন্দোলনকে ঘিরে আমার স্বপ্ন। আমি এ আন্দোলনের উপরেই কাজ করতে চাই। ইন্টারভিউতে উত্তীর্ণ হওয়া না হওয়াটা আল্লাহ্র ইচ্ছা'। আমার এ জওয়াবে তিনি আদৌ খুশী হননি।

যথাসময়ে ইন্টারভিউ শুরু হ'ল। তিন-চার মিনিটে সবাই বেরিয়ে আসছে। এক সময় আমার ডাক পড়ল। সালাম দিয়ে ঢুকলাম। সুসজ্জিত কক্ষ। সদস্যদের বাইরে একজন আছেন বৃটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি। তিনি পরীক্ষার্থীর ইংরেজী জ্ঞান পরখ করেন। পুরা ইন্টারভিউটা হয় ইংরেজী ভাষায়। আমি আমার গবেষণা শিরোনাম বললাম। সবাই যেন চমকে উঠলেন। কেননা বিষয়টি এযাবত কেউ পিএইচ.ডির জন্য নির্বাচন করেনি। তবে 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর সাবেক ডিজি ও চবি-র প্রফেসর ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান প্রথমেই বিষয়টি পসন্দ করে মতপ্রকাশ করলেন। এবার শুরু হ'ল প্রশ্নোত্তরের পালা। ঢাবি-র প্রোভিসি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ মাহফূযুল্লাহ বললেন, Mr. Ghalib! Explain your movement. আমি ইংরেজীতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মূলনীতিগুলি সাবলীল ভঙ্গিতে বলে গেলাম। অতঃপর ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমাদ খান প্রশ্ন করলেন, What is the differance between tareeqah-i. Muhammadia mavement and Ahle hadeeth movement? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দিলাম। অতঃপর ঢাবি-র প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী প্রশ্ন করলেন, Is there any publication on the movement by you? আমি yes বলেই ফাইল থেকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বই বের করে প্রত্যেক সদস্যের হাতে এক কপি করে দিলাম। বৃটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি আমাকে বললেন, Why do you wish to go to London for study on Ahle hadeeth, rather the mejority Ahlehadeeth People lives in Indian Sub-continent and in the Middle East? (আপনি কেন লণ্ডন যেতে চান? অথচ অধিকাংশ আহলেহাদীছ জনগণ ভারত উপমহাদেশে ও মধ্যপ্রাচ্যে বসাবস করে?) জবাবে বললাম, আমি কখনোই লণ্ডন যাব না, যদি আপনাদের বিখ্যাত লাইব্রেরীটি ঢাকায় এনে দিতে

পারেন। জবাব শুনে সবাই হেসে উঠলেন। অতঃপর অনুমতি পেয়ে সবার সপ্রশংস দৃষ্টির মধ্যে ২৭ মিনিট পরে বেরিয়ে এলাম। পরীক্ষার্থীরা সব ঘিরে ধরল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন- এত দেরী কেন হ'ল? বিকালে ফলাফল প্রকাশিত হ'ল। আমার নাম প্রথমে, অতঃপর আবুবকর রফীক। আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে চলে এলাম। গেইট পার হবার সময় বোর্ডের সদস্য প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী গাড়ী থেকে নেমে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, Mr. Ghalib! you know I am also an Ahle hadeeth.

৪. বিমক ফেলোশীপ-এর নিয়ম ছিল প্রতিবছর কাজের অগ্রগতি বিবেচনায় বৃত্তি নবায়ন হওয়া। কিন্তু তিন বছর পর চাহিদা অনুযায়ী উন্নতি দেখাতে ব্যর্থ হ'লে বৃত্তি বাতিল হয়ে যায়। বিমক-এর আইনী খড়গ আমার উপর চাপানো হবে-তা বুঝলাম তখনই যখন বারবার মৌখিক ও লিখিত আবেদন করেও বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পেলাম না। ১৯৮৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তিন বছর পূর্ণ হবে। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ঢাকায় একদিন কথায় কথায় আমার একান্ত সুহৃদ আব্দুল মতীন সালাফীকে বিষয়টা বললাম। শুনে উনি চমকে উঠে বললেন, আপনি এতটা সরল মানুষ তাতো বুঝতে পারিনি। এটাইতো আপনাকে ডুবানোর সুযোগ। আইনী কারণে ব্যর্থ হ'লে আপনার বিরুদ্ধে বলা সহজ হবে যে, নিজ অযোগ্যতার কারণে আপনি পিএইচ.ডি করতে পারেননি। আমি আপনার যাতায়াত খরচের ব্যবস্থা করছি। আপনি প্রস্তুত হন।' তার ব্যাখ্যা শুনে আমি হতবাক হ'লাম। তবে ইতিপূর্বে একাধিকবার ধোঁকা খেয়েছি বলে তেমন বিস্মিত হইনি। অতঃপর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ২১.১২.১৯৮৮ইং তারিখে আমি করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এটাই ছিল আমার প্রথম বিদেশ সফর। সত্যি কথা বলতে কি, আল্লাহ পাকের মহান ইচ্ছায় ঐসময় আব্দুল মতীন সালাফী যদি ভূমিকা না নিতেন, তাহলে আমার স্বপ্নসাধ পূর্ণ হ'ত কি-না সন্দেহ। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন- আমীন!

হাঁ, তাকেও 'যুবসংঘ'কে সমর্থন করার অপরাধে (?) মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এরশাদ সরকারের মাধ্যমে 'কালো তালিকাভুক্ত' করে ২.৭.১৯৮৯ইং তারিখে মাত্র ৩ ঘণ্টার নোটিশে স্বদেশে (ভারতে) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেদিন তার বিদায়ের দৃশ্য ছিল অতীব করুণ। কোনক্রমেই বুঝতে পারছিলাম না কেন এটা ঘটল। পরে আসল ঘটনা জানতে পেরে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। এত বড় পদে আসীন ব্যক্তির দ্বারা এত নীচু ও অমানবিক কাজ সংঘটিত হতে পারে তা ছিল আমাদের ভাবনার বাইরে। এ ঘটনার পিছনে তাঁর এই ষড়যন্ত্রের বাস্তব সাক্ষী ছিলেন তৎকালীন খাদ্যমন্ত্রী সরদার আমজাদ হোসেন (রাজশাহী)। যা তিনি সেসময় মাওলানা মুসলিম, মাহমূদ আলম ও আমার সামনে প্রচণ্ড উষ্মার সাথে বর্ণনা করেছিলেন।

৫. বই-পত্র এখনকার মত সহজলভ্য ছিল না। তাই প্রথম তিন বছর বলতে গেলে আমি তেমন কোন কাজ করতে পারিনি তথ্য-উপাত্ত অভাবে। মূল বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করলাম বিদেশ থেকে সংগৃহীত কিতাব-পত্র ও অন্যান্য উপাদানসমূহ পাওয়ার পর। ইতিমধ্যে আমি একবার যাত্রাবাড়ী মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহ্র লাইব্রেরীতে বসে কিছুদিন পড়াশুনা করতে চেয়েছিলাম। কারণ লাইব্রেরীটি ছিল আমার হাতে গোছানো এবং সেখানে রক্ষিত পুরানো কিতাব সমূহের অনেকগুলি আমার গবেষণায় কাজে লাগত। কিন্তু অনুমতি মিলেনি। পরে শেষবারের মত একদিন আমি ঢাবি-র আরবী বিভাগ থেকে ইউজিসিতে ফোন করে সরাসরি বিমক চেয়ারম্যানের কাছে বিষয়টি তুলে ধরলাম। কিন্তু খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তিনি এড়িয়ে গেলেন। এ সময় আমার সাথে ছিলেন যাত্রাবাড়ীর শিক্ষক বেলাল হোসায়েন রহমানী (গোদাগাড়ী)। পরে জেনেছি তাঁদের প্রকাশিত এক প্রচারপত্রে আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অপবাদ ছড়ানো হয়েছে। মনের দুঃখে কুয়েতে ও রিয়াদে পত্র লিখলাম। দু'জায়গা থেকেই কিতাব আসল যথাক্রমে ৬১৯ ও ১২১ কেজি করে। কিন্তু ঠিকানায় ওঁরা প্রযত্নে ওঁনার নাম দিয়েছে। ফলে বিমানের Way-bill ওঁনার ঠিকানায় চলে যায়। পরে কিতাব আনার সময় ওঁনার প্রশ্নের জওয়াবে বললাম, স্যার! দেশে যখন কেউ সাহায্য করেনি, তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বিদেশে পত্র লিখেছিলাম। আল্লাহ রহম করেছেন। এরপরে তিনি চুপ ছিলেন। অবশ্য রিয়াদের কিতাবগুলি সরাসরি রাবি-তে এসেছিল। মানুষ পথ বন্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তা খুলে দিলেন এমনভাবে, যা আমার ধারণারও বাইরে ছিল। *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

৬. পিএইচ.ডির মধ্যম পর্যায়ে তখন আমি দারুণ ব্যস্ত। ওদিকে স্ত্রী তার তিন ছেলেমেয়ে সামলিয়ে চরম ব্যস্ততার মধ্যে এম.এ. পরীক্ষা দিচ্ছে। আর মাত্র ২টি পরীক্ষা বাকী। এ সময় আবার খড়গ চাপল উপর মহলের। হঠাৎ একদিন রাত ১০-টার দিকে দরজায় করাঘাত। পরিচিত কণ্ঠ শুনে দরজা খুললাম। দেখি পরিচিত লোকটির সাথে এক অপরিচিত ব্যক্তি। তারা ঘরে ঢুকল টলতে টলতে। জীবনে মদের গন্ধ কেমন জানিনা। কুরআন-হাদীছে ভরা ঘর মদের দুর্গন্ধে ভরে গেল। জড়িয়ে জড়িয়ে সে বলল, 'চাচা আমাকে এক লাখ টাকা দিয়েছে, আপনি আমাকে দু'লাখ টাকা দেন, এখানে কেউ আপনার বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে পারবে না। নইলে আপনাকে এখান থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে চলে যেতে হবে'। বললাম, 'কেন যেতে হবে আমাকে? তাছাড়া মাসের শেষ। এখন কোথাও খালি বাসা পাওয়া যাবে না। গেলে আগামী মাসের ১ তারিখে যাব। কিন্তু সে কোন কথা শুনতে রাজী নয়। বললাম, বেশ। আমি যাব। দু'লাখ টাকা নয়, সাধুর মোড়ের লোকদের দু'ফোটা বিদায়ী অশ্রু তার চাইতে আমার নিকটে অধিক মূল্যবান।' যাতে আমি ৭ দিনের মধ্যে অবশ্যই যাই, সেজন্য ২দিন পরে সে তার দলবল আমার উপর পুনরায় হামলা করে স্থানীয় হোমিও ডাক্তারখানার মধ্যে। সেদিন এলাকার মুরব্বী আফসার আলীর নিঃস্বার্থ সহযোগিতার কথা আমি সর্বদা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা দিন। অতঃপর পরের সপ্তাহেই রাজশাহী সাধুর মোড়ের বাসা ত্যাগ করে হড়গ্রামে এক বাসায় উঠতে হল। হিংসার আগুন যে কত তীব্র হতে পারে তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

৭. স্নেহাস্পদ ছাত্রকর্মী আযীযুর রহমানের (নাচোল) চেষ্টায় হড়গ্রামে একটা খালি বাসার সন্ধান পাওয়া গেল। ২০শে ডিসেম্বর ১৯৯০ আমরা হড়গ্রামের নতুন বাসায় এলাম। সবাই অপরিচিত। স্থানীয় আহলেহাদীছ মসজিদে খুৎবা দিলাম। মসজিদ কমিটির জনৈক প্রভাবশালী সদস্য বললেন, এই মসজিদে আজই প্রথম আহলেহাদীছ-এর সত্যিকারের খুৎবা শুনলাম। এযাবত কেউ 'আহলেহাদীছ' নামটিও এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেনি'। সেদিন জয়পুরহাট যেলা যুবসংঘের সভাপতি 'মাহফূয' মসজিদে উপস্থিত ছিল। উল্লেখ্য যে, আশপাশের বহু হানাফী মুছল্লী এখানে ছালাত আদায় করেন। খতীব আহলেহাদীছ হলেও জামায়াতপন্থী লোক হওয়ায় তাদের খুৎবা হ'ত সর্বদা সকলকে খুশী করা ও ভোটমুখী। ফলে কুরআন-হাদীছের প্রকৃত

বিষয়গুলি মুছল্লীরা জানতে পারত না। আমি সাধুর মোড়ের অভ্যাসমতে প্রতি মঙ্গলবার বাদ আছর মসজিদে সাপ্তাহিক তাফসীরের ঘোষণা দিলাম। শুরু হ'ল দাওয়াতী কাজের প্রসার। শিক্ষিত ভাইদের আগমন বাড়তে লাগল। কিছুদিনের মধ্যেই ৬ জন ভাই 'আহলেহাদীছ' হলেন। কিন্তু এটাই অবশেষে কাল হ'ল।

যিনি আমাকে এখানে আনার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী ছিলেন, সেই অতি ভক্ত মাওলানাই রুষ্ট হলেন। কেননা উনি নিজেকে এলাকার 'পীর' বলতেন। মসজিদে আমার অনুরাগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায় তিনি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। ফলে তাঁর লোকদের ইশারায় স্থানীয় কিছু মূর্খ ব্যক্তি বাজারে ৪দিন আমাকে অপমান করল। এদিকে ঢাকা থেকে এসে মাননীয় নেতা শুধু আমার কারণেই দলবল নিয়ে এলেন একদিন আছরের সময় পূর্ব ঘোষণা দিয়ে। তিনি সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু বললেন এবং আশ্বাস দিয়ে গেলেন বিদেশী অনুদানে মসজিদ পুনর্নির্মাণ করে দেবেন (যদিও আজও তা হয়নি)। আশ্বাস পেলেন মসজিদ কমিটির দুই নেতা তাদের ছেলেদের চাকুরীর। ফল হল দ্রুত। উনি চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই মসজিদ কমিটির সেই দুই নেতা এসে আমার হানাফী বাড়ীওয়ালাকে বলে গেলেন যেন আমি ২৮শে জানুয়ারী ১৯৯২-এর মধ্যে হড়গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। বছরের ব্যবধানে আবার সপরিবারে বাসা ছাড়ার হুমকি আমাকে চরম বেকায়দায় ফেলে দিল। অন্যদিকে ৩১.১২.৯১ইং তারিখের মধ্যে থিসিস জমা দেওয়ার চূড়ান্ত মেয়াদ শেষ হবে, তা নিয়েও দারুণ টেনশনে আছি। যাহোক আল্লাহ্‌র অশেষ রহমতে পরে হানাফী নেতারাই আমাকে সাহায্য করেন। ফলে সে যাত্রায় রক্ষা পাই। কিন্তু ঐ আহলেহাদীছ মসজিদে আমার যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। ফলে পরবর্তী কয়েকবছর আমাকে স্থানীয় হানাফী মসজিদেই ছালাত আদায় করতে হয়েছে। অতঃপর ১৯৯৬ সালের ২৬শে এপ্রিল আমি সপরিবারে নওদাপাড়ার বর্তমান বাসায় চলে আসি।

৮. আমার সুপারভাইজর একজন কট্টর মুক্বাল্লিদ হানাফী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পাকিস্তানী উস্তাদ প্রফেসর এইচ. দানীর উপদেশ মোতাবেক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর পিএইচ.ডি গবেষণার ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাছাড়া গবেষণাকর্মে তিনি আমার উপর খুবই আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট ছিলেন। তাই সবদিকে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে তাঁর উপর নানাবিধ চাপ সৃষ্টি করা হয় যাতে উনি থিসিস অনুমোদন না করেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি। থিসিস জমা দেবার পূর্বে পরীক্ষকমণ্ডলী গঠনের সময় সুপারভাইজর ছাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম যেন কোন আহলেহাদীছ প্রফেসর আমার পরীক্ষক না থাকেন। তিনি আমার অনুরোধ রেখেছিলেন। ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য হানাফী ও পীরপন্থী প্রফেসরদের হাত দিয়েই সর্বসম্মতিক্রমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর উপর কৃত এই ডক্টরেট থিসিস পাস হয়ে যায় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট তা অনুমোদন করে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*।

তাই বলতে পারি, প্রচণ্ড মানসিক নির্যাতন এবং কঠিন বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়েও এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে গবেষণাকর্ম সফলভাবে শেষ করতে পারার পিছনে যেমন দেশ ও বিদেশের উদারপন্থী বিদ্বানদের সহযোগিতা রয়েছে, তেমনি এর বিরোধিতায় সবরকমের বাধা সৃষ্টি করেছেন কতিপয় আহলেহাদীছ নেতা, আলেম ও তাঁদের অজ্ঞ অনুসারীগণ। আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করুন!

আরেকটি ঘটনা না বললেই নয়, ১৯৯০ সালের ২২শে নভেম্বর। থিসিসের হস্তলিখিত ৭৫০ পৃষ্ঠার গোটা পাণ্ডুলিপি নিয়ে চট্টগ্রামে ১২ দিন অবস্থান করে মূল্যায়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর মুঈনুদ্দীন আহমাদ খানকে দেখানোর পর আমি রাজশাহী ফিরছি। এবারে টাইপে দেব। সঙ্গী ছিলেন আব্দুছ ছামাদ সালাফী। ঢাকা থেকে কোচটি লালপুর-বাঘা হয়ে আসছে। হঠাৎ রাত ২-২০ মিনিটে ঈশ্বরদী-লালপুরের মধ্যবর্তী এক আখক্ষেতের কাছে যাত্রীবেশী ডাকাতেরা ছুরি বের করে ডাকাতি শুরু করল। কয়েকজন রক্তাক্ত হল। একটু পর যার যা আছে সব নিয়ে ওরা নেমে পড়ল। আমার ও সালাফী ছাহেবের ব্যাগ দু'টিও তারা নিল। সব নেয়া শেষ করে আখক্ষেতের পাশে মালামাল জমা করছিল। এবার গাড়ী ছাড়বার উপক্রম। এ সময় সীট থেকে উঠে ডাকাত সর্দারটাকে ডেকে বললাম, 'ঐ কালো ব্রীফকেসটা আমার। ওটা ফেরৎ দাও। ওতে কিছু নেই কাগজ-পত্র ছাড়া।' সে বিনা বাক্য ব্যয়ে নেমে গিয়ে প্রথমে সালাফী ছাহেবের ব্যাগটা আনল। বললাম, আরেকটা আছে। ইশারায় দেখিয়ে দিলাম। চাঁদনী রাত। সব দেখা যাচ্ছিল। সে আবার নেমে গিয়ে আমার ব্রীফকেসটা এনে দিল। তারপর গাড়ী ছাড়ল। আমি আলহামদুলিল্লাহ বলে বসে পড়লাম।

ব্যাপারটা ছিল এই যে, সর্দারটি বাসে আমার সীটের অনতিদূরে বসেছিল। রাস্তায় কয়েকবার ওকে সিগারেট খেতে নিষেধ করায় সে আমার প্রতি দুর্বল ছিল। তাছাড়া আমাদের মাথায় টুপী ছিল এবং যাত্রীরা যাতে কেউ সিগারেট না খায় ও ড্রাইভার যাতে ক্যাসেট না বাজায় সেজন্য আমার উপদেশমূলক কথায় সে হয়ত প্রভাবিত হয়েছিল। ফলে ওর সাথীরা ব্রীফকেস নিয়ে গেলেও সে নিজ হাতে তা ফিরিয়ে দিয়ে যায়। সেদিনই মনে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল যে আমার এই সাধনা আল্লাহ কবুল করেছেন। নইলে ডাকাতের হাত থেকে অলৌকিকভাবে এ পাণ্ডুলিপি ফেরৎ আসতো না.. فلله الحمد والمنة।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি?

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন আহলেহাদীছ আন্দোলনের সামাজিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য।

ওসামা ট্র্যাজেডি এবং 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র আরেক ভেল্কি

আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহীম

গত ১লা মে ২০১১ সাম্রাজ্যবাদী মিডিয়ার সৃষ্টি তথাকথিত 'পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম সন্ত্রাসী' সঊদী নাগরিক ওসামা বিন লাদেন নিহত হয়েছেন। পশ্চিমা বিশ্বের 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' তত্ত্বের দাবার ঘুটি হিসাবে ব্যবহৃত বহুল আলোচিত, সমালোচিত এই ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুতে সারা বিশ্ব যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। যার ভয়ে পশ্চিমা বিশ্বের রাতের ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছিল, সেই ওসামাকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করে পশ্চিমারা বন্য উল্লাসে ফেটে পড়েছে। তাই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমা সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের উল্লসিত কণ্ঠ ছিল এমন- Justice has been done 'এই হত্যার মাধ্যমে ন্যায়বিচার সংঘটিত হয়েছে।' যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য Death will bring great release -'এই মৃত্যু বিরাট স্বস্তি আনবে। ওসামা সৃষ্টির অন্যতম নায়ক সেই জর্জ ডব্লিউ বুশের তাৎক্ষণিক বক্তব্য হল- Momentous victory for America 'এটি আমেরিকার জন্য একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ বিজয়।' কিন্তু এই কাপুরুষোচিত হত্যাযজ্ঞ কিভাবে পশ্চিমা বিশ্বের জন্য এত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল তা জানাই আলোচ্য নিবন্ধের মূল উপজীব্য।

ওসামা বিন লাদেন ১৯৫৭ সালে সঊদী আরবের এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আফগানিস্তান গমন করেন। আমেরিকা আপন স্বার্থের খাতিরে আফগান মুজাহিদদেরকে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। আফগান যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ বিজয়লাভের পর ১৯৯০ সালে ওসামা বীর বেশে স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৯০ সালে আমেরিকার প্ররোচনায় সাদ্দাম কুয়েত আক্রমণ করার পর আমেরিকা ভোল পাল্টিয়ে কুয়েত ও সৌদি আরবের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হয়। আমেরিকার এই হীন মুনাফেকী কূটনীতির পিছনে স্বার্থ ছিল, কুয়েত এবং সৌদি আরবে স্বীয় ঘাঁটি স্থাপন করা। অন্যদিকে বাদশাহ ফাহাদও নিজ দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাহায্য কামনা করেন। এসময় ওসামা বিন লাদেন বাদশা ফাহাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিধর্মীদের সাহায্য না নেওয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু সব বাধা উপেক্ষা করে সঊদী সরকার আমেরিকানদের আমন্ত্রণ জানালে তিনি সঊদী সরকারের বিরুদ্ধে জনসম্মুখে কথা বলেন। ফলে ১৯৯২ সালে সঊদী সরকার তাকে দেশ থেকে বহিস্কার করে এবং তাকে সুদানে নির্বাসন দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালে সুদান অবস্থানকালে তাঁর সঊদী নাগরিকত্বও কেড়ে নেয়া হয়। ১৯৯৬ সাল তিনি সুদান হতে আফগানিস্তানের জালালাবাদে ফিরে আসেন এবং তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের সাথে জোট বাঁধেন। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিশ্বাস্য ঘটনা সংগঠিত হয়, যাতে নিমিষেই গুড়িয়ে যায় আমেরিকার অহংকার দু'টি বিরাটকায় টাওয়ার। অস্বাভাবিক এই হামলার সম্পূর্ণ দায়ভার তাৎক্ষণিকভাবে কোন তদন্তের পূর্বেই চাপিয়ে দেয়া হয় ওসামা বিন লাদেনের ঘাড়ে। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ সরাসরি তাঁকে দায়ী করে টেলিভিশনে তাৎক্ষণিক বার্তা প্রেরণ করলেন। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা আজও পর্যন্ত কোন তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। তাদের উদ্দেশ্য তখনই যেমন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল, আজও তা তেমনই সুস্পষ্ট। তা হল টুইন টাওয়ার হামলা ছিল নিছক আইওয়াশ; মূলতঃ এর পিছনে যারা কলকাঠি নেড়েছিল তাদের উদ্দেশ্য ছিল ওসামার ঘাড়ে সওয়ার হয়ে মুসলিম জাতিকে নিধনের সুদূরপ্রসারী এক নীল-নকশা আঁটা। যার মাধ্যমে একদিকে বিশ্বব্যাপী একক কর্তৃত্ব সম্প্রসারণ করা, অন্যদিকে একটি সম্ভাবনাময় মুসলিম সভ্যতার প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। এ লক্ষ্যেই তারা ৯/১১-এর নাটক মঞ্চস্থ করে এবং এর মাধ্যমে কেবল ওসামা বিন লাদেনকে নয়, বরং সমগ্র মুসলিম জাতিকেই বিশ্বের নিকট সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে পরিচিত করার সুযোগ গ্রহণ করে।

আজ এ ঘটনার ১০ বছর পর এসে আমরা বলতে পারি, আমেরিকা তার অসৎস্বার্থ চরিতার্থ করতে যথেষ্টই সফল হয়েছে। মুসলিমবিশ্বের গায়ে সন্ত্রাসী তকমা লাগিয়ে নানা দেশে তারা নীরবে ফায়দা লুটে নিচ্ছে। অন্যদিকে নিজেদেরকে শান্তিকামী সাধুর ইমেজেও প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। যে 'শান্তিকামী' সন্ত্রাসীদের পিছনের ইতিহাস কেবল সন্ত্রাসেরই ইতিহাস, এই অর্জন যে তাদের কাছে বড় তাৎপর্যপূর্ণই হওয়ার কথা, তা আর বলতে কি। নিরস্ত্র ওসামাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তারা নিজেদের তথাকথিত 'শান্তিকামী' ইমেজটাই আরেকবার বিশ্ববাসীকে দেখানোর কোশেশ করেছে।

অথচ বিশ্বের এমন কোন দেশ খুঁজে বের করা সত্যিই দুষ্কর যেখানে মার্কিন হস্তক্ষেপ ঘটেনি। জ্বলন্ত প্রমাণগুলোর একটি হল- ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির উপর মানব ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ নৃশংস পারমাণবিক আক্রমণ। যে আক্রমণে মাত্র ২ মিনিটের মধ্যে প্রায় দেড় লক্ষ জাপানী মৃত্যুবরণ করে। ১৯৫০-৭৩ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধে তারা মোট পঁচিশ থেকে ত্রিশ লক্ষ ভিয়েতনামীকে হত্যা করে। ১৯৫৫-৭৩ সালে কম্বোডিয়ায় আমেরিকার প্রত্যক্ষ মদদে দশ থেকে বিশ লক্ষ কম্বোডিয়কে হত্যা করা হয়। ১৯৫৯-৮০ কিউবার বিপ্লবের পর আমেরিকার রাসায়নিক ও জৈবিক অস্ত্র প্রয়োগের ফলে বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে কিউবায়। ফলে বহু মানুষ ও পশু মারা যায় এবং ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৯৮১ নিকারাগুয়ায় ফার্ক বিদ্রোহীদের উস্কানী ও অস্ত্র সহযোগিতা দিয়ে গোপন সন্ত্রাস পরিচালনার মাধ্যমে এ পর্যন্ত আমেরিকা তের হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করেছে। ১৯৮৯ সাল পানামায় সাম্রাজ্যবাদীদের আগ্রাসনে কয়েক হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৮১-৮৯ সি,আই,এ লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মুআম্মার গাদ্দাফীকে হত্যা করতে গিয়ে তার দু'বছরের শিশুকন্যাকে হত্যা করে। তাদের সামরিক আগ্রাসনে সেই সময় লিবিয়ায় শতশত মানুষ নিহত হয়েছে। বর্তমানে তারা আবার সেই গাদ্দাফীকে সরানোর জন্য গাদ্দাফী বিরোধীকে দিয়ে এবং ন্যাটো বাহিনীর মাধ্যমে হাজার হাজার বনু আদমকে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করছে এবং অগণিত স্থাপনা ধ্বংস করছে। ১৯৬০ সালে কলম্বিয়ায় মাদক চোরাচালান বন্ধ করার নামে মার্কিন অস্ত্র, সেনা এবং প্রশিক্ষণে কলম্বিয়া সরকার সাতষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে। ১৯৯৯ সালে কসোভোয় আকাশ পথে আক্রমণ চালিয়ে ৩,০০০ এর বেশি মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে তাদেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ইসরাঈলী সেনাবাহিনী কয়েক হাজার ফিলিস্তিনীকে হত্যা করে। তেমনিভাবে ২০০১ সালের ৭ই

অক্টোবর আফগানিস্তানে হামলার মাধ্যমে অদ্যাবধি প্রায় ১০ লক্ষ বনু আদমকে হত্যা করেছে এবং ২০০৩ সালের ২৩ শে মার্চ ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে আজ পর্যন্ত প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকার এই নিকৃষ্ট পরিচয় সবারই জানা। কিন্তু তাদের নিখুঁত ভড়ং দেখে প্রায়শই মতিভ্রম ঘটে যায়।

তবে সবার উপর সত্য হল– সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। তাই মার্কিনীদের টুইন টাওয়ার নাটকের নেপথ্য খোদ সেদেশেরই বুদ্ধিজীবিরা প্রকাশ করে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ জনের মত বুদ্ধিজীবি এ বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে গেছেন। তাদের নেতৃত্বে আছেন সে দেশের একটি বিশ্ববিদ্যায়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন জোন্স। ৯/১১ ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিউইয়র্কের একটি পত্রিকায় এ সম্পর্কিত এক রিপোর্টে তাঁর উদ্ধতি দিয়ে বলা হয় যে, তিনি বলেন, বিমান দুটি

যেভাবে আঘাত হানে, তাতে টুইন টাওয়ার ধসে পড়া অসম্ভব। তার মতে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন দখলদারিত্বকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে যুক্তরাষ্ট্রের রণোন্মাদনাই ঘটিয়েছিল এ জঘন্য ঘটনা। বুদ্ধিজীবিদের নিকট হতে আরো বলা হয় যে, 'নিউ আমেরিকান সেঞ্চুরী' শীর্ষক একটি প্রকল্পের অধীনে আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলার অজুহাত সৃষ্টির জন্য ৯/১১ এর ঘটনা ঘটানো হয়। ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজের দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যও এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলার বৈধতা প্রমাণ করতেই যুক্তরাষ্ট্র টুইন টাওয়ার ধ্বংসের নাটক মঞ্চস্থ করেছে। ৯/১১-এর ঘটনা যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের পরিকল্পিত সাজানো নাটকই না হত তাহলে কেন ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে কর্মরত ৪ হাজার ইয়াহুদীর একজনও ঐ ঘটনার দিন কাজে যোগদান করেনি। বিমান হামলায় যারা আহত এবং নিহত হয়েছিল তাদের মধ্যে কেউই ইয়াহুদী ছিল না। ৯/১১ ঘটনার সময় নিউইয়র্কে ইস্টার্ন কোষ্ট জায়োনিষ্টদের এক জমকালো উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল ইসরাঈলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারনের। তিনি অনুষ্ঠানটিতে যোগ দেওয়ার জন্য খুবই উৎফুল্ল ছিলেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইসরাঈলী গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের জেনারেল সিকিউরিটিস এপারেটাস (সাভাক) এরিয়েল শ্যারনকে উক্ত উৎসবে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। শুধু তাই নয় আত্মঘাতী বিমান হামলার চার ঘণ্টা পর টুইন টাওয়ার সংলগ্ন একটি ভবন থেকে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থা এফ,বি,আই ধ্বংসযজ্ঞের ছবি ভিডিও করা অবস্থায় ৫ ইয়াহুদীকে গ্রেফতার করে। এ সময় ইয়াহুদীরা ভিডিও করার সাথে সাথে হাসি–ঠাট্টা করছিল। তাছাড়া হামলাকারী বিমানের চারজন পাইলটই ছিল মার্কিনী। তারপরও কোন প্রমাণ ছাড়াই ওসামাকে দায়ী করে তারা ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর রবিবার রাতের অন্ধকারে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের উপরে বর্বরোচিত হামলা চালায়। আজও চলছে তাদের এই ধ্বংসাত্মক মরণখেলা। তারা ধ্বংস করে চলেছে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলি। হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ বনু আদম। প্রতিবেশী রাষ্ট্র উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তানসহ মধ্যএশিয়ার তৈলসমৃদ্ধ গরীব দেশগুলিকে কব্জা করার জন্য আফগানিস্তানকে তাদের খুবই প্রয়োজন ছিল। সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদীরা পুতুল সরকার বসিয়ে আজও আফগানিস্তানকে দখল করে রেখেছে।

তাতেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলি পঙ্গু করার জন্য মারণাস্ত্রের দোহাই দিয়ে প্রায় দেড় বছরের মাথায় ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ দিবাগত রাত্রির শেষ প্রহরে বাগদাদবাসী যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তখন তাদের উপর বৃষ্টির মত নেমে আসে হাজার হাজার টন বোমা। নিহত হয় লক্ষ লক্ষ বনু আদম। ধ্বংস করে দেওয়া হয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহ। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১৯৪৫ সালে হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমার চাইতে ১০ গুণ বেশি বিস্ফোরক ব্যবহৃত হয়েছে কেবল ইরাকেই। হাজার হাজার টন বোমা নিক্ষেপের মাধ্যমে পুরো ইরাককে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। লুটপাট করা হয় সে দেশের প্রধান খনিজসম্পদসহ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদ। ধ্বংস করা হয় মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি বাগদাদের ঐতিহ্যবাহী লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন ঐতিহসিক স্থাপনা। ইতিপূর্বে ১৯৮৯ সালে সিনিয়র বুশ সাদ্দামকে কুয়েতের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে পুনরায় নিজেই মধ্যপ্রাচ্যের ত্রাণকর্তা সেজে কুয়েত ও সঊদী আরবের মাটিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করে। তারপর জাতিসংঘের মাধ্যমে ইরাকের উপর অবরোধ চাপিয়ে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ইরাককে পঙ্গু করে রাখে এবং সেখানকার প্রায় পনের লক্ষ বনু আদমকে অনাহারে, অর্ধাহারে, অপুষ্টিতে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করে।

এখন তারা টার্গেট করেছে পাকিস্তানকে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান মধ্যএশিয়ার মুসলিমপ্রধান ৬টি দেশ নিয়ে একটি ইসলামী ব্লক গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমেরিকার শ্যেনদৃষ্টি পড়ে পাকিস্তানের দিকে। কারণ কোন অঞ্চলে ইসলামী শক্তির উত্থান ঘটুক, আমেরিকা তথা ইয়াহুদী, খৃষ্টানরা তা কখনো কামনা করেনা। বর্তমানে এই চক্রের সাথে হাত মিলিয়েছে ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত। তাদের উদ্দেশ্য এই সুযোগে কাশ্মীর ও পাকিস্তানকে ঘায়েল করা। কিছু না হোক মার্কিন গোয়েন্দাদের মাধ্যমে পাকিস্তানের ২৪টি পারমাণবিক বোমা চুরি করা অথবা এর প্রযুক্তি হস্তগত করা। তালেবানদের দমন ও পারমাণবিক স্থাপনার নিরাপত্তাদানের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক আগ্রাসন ও দখলদারিত্ব কায়েমের পথ সুগম করার নীল নকশা আঁটছে তারা।

এই সময়ই আমেরিকা পাকিস্তানে ওসামা বিন লাদেনের আস্তানা আবিষ্কার করে বসে। তাও আবার পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদের খোদ এ্যাবটাবাদ সেনাঘাঁটির নিয়ন্ত্রিত এলাকার মধ্যেই। কাপুরুষোচিতভাবে তারা নিরস্ত্র ওসামার উপর আক্রমণ চালায় এবং তাতে তিনি নিহত হয়েছেন বলে দাবী করে। মার্কিন সূত্রগুলো তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করলেও সারাবিশ্বে এ বিষয়ে ব্যাপক ধূম্রজাল রয়ে গেছে। কেননা তাকে যদি হত্যাই করা হল

তাহলে তার লাশের ছবি প্রকাশ করা হল না কেন? তাছাড়া ওবামা ঘোষণা দিয়েছেন যে, ওসামার ছবি কোনদিন প্রকাশ করা হবে না। এর উদ্দেশ্য কী? আবার জীবিত ওসামার মত মৃত ওসামাও তাদের কাছে ভয়ংকর। তাই এ্যাবোটাবাদ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে নিয়ে সে লাশ সমুদ্র ফেলে দেওয়া হল। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা প্রশ্ন তুলেছেন, আসলে পুরো ঘটনাটাই আরেক ধাপ্পাবাজি। রাজনীতি বিশ্লেষক আলেক্সান্ডার ককবার্ন 'মিথ্যার আগ্নেয়গিরি' শিরোনামে লিখিত এক প্রবন্ধে বলেছেন যে, ওবামা, হিলারীসহ শীর্ষ মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টারা অভিযানের ঘটনা সরাসরি দেখেছেন বলে যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে সেটি সম্ভবত ছিল তাদের সবাই মিলে বাস্কেট বল খেলা দেখার দৃশ্য। তার কারণ মার্কিন এক কর্মকর্তা পেনেট্টা বলেন, মার্কিন বাহিনী ওসামার কথিত কম্পাউন্ডে ঢোকার আগেই সরাসরি ভিডিও লিংক বন্ধ হয়ে যায়। তারা প্রথমে দাবি করে ওসামা সশস্ত্র ছিলেন কিন্তু মার্কিন কর্মকর্তা পেনেট্টা বলেছেন, তিনি ছিলেন নিরস্ত্র। আত্মরক্ষার জন্য তিনি তার স্ত্রীর পিছনে লুকিয়ে তার স্ত্রীকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেন। পরে বলা হয় তিনি তা করেননি। প্রথমে তারা বলে তার স্ত্রী তাকে রক্ষা করতে আসলে তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়, কিন্তু পরে জানানো হয় তার স্ত্রীর পায়ে গুলির আঘাত লাগে। আর যে মৃত্যুবরণ করেছে সে অন্য একটি মহিলা ছিল। বিস্মিত হতে হয় একটি জিনিস ভেবে যে, যাকে নিয়ে মার্কিনীদের এতটা ব্যগ্রতা, যার কারণে বিশ্ববাসীর নিদ্রা হারাম হয়ে গিয়েছিল, তাকে হত্যার জন্য অভিযানটা পরিণত হল যেমন নির্বিচার ও নির্মম এক হত্যাকাণ্ডে, তেমনি হল একেবারেই নির্বিঘ্ন ও নিষ্কণ্টকভাবে। ঠাণ্ডা মাথায় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে অতি গোপনে ভিনদেশী সৈন্যরা অনুপ্রবেশ করল। অথচ সে দেশের প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা কিছুই জানতে পারল না। এখান থেকেই সুস্পষ্ট যে, যুক্তরাষ্ট্র কোন দেশের সার্বভৌমত্বকে কতটা হেলাফেলার চোখে দেখে।

যাহোক ওসামার মৃত্যুসংবাদ প্রচার হওয়ার সাথে সাথে সারা বিশ্বের মানুষের নিকট বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে লাগল যে, এটি ওসামার কততম মৃত্যু? কেননা এর পূর্বে ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর 'দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রিবিউন' খবর প্রকাশ করেছিল ২০০১ সালের ইসরাঈল ও মার্কিন সেনাদের অভিযানে আফগানিস্তানে ওসামা নিহত হয়। ২০০৬ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর 'টাইম ম্যাগাজিন' খবর দিয়েছিল, আফগানিস্তানে তোরাবোরা পর্বতে মার্কিন অভিযানে আট বছর আগেই ওসামা নিহত হয়। সেই সময় 'টাইম ম্যাগাজিন'-এ আরও বলা হয়, ছয়মাস আগেই আফগানিস্তান ও পকিস্তান সূত্রে তারা জানতে পেরেছিল, ২০০১ সালের ডিসেম্বরে ওসামা মারা যায় এবং আফগনিস্তানের দক্ষিণ–পূর্ব পার্বত্য এলাকায় তাঁকে দাফন করা হয়। পত্রিকাটি আরও খবর প্রকাশ করে দিয়েছিল যে, পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এ কথা স্বীকার করেছিলেন। মিসরীয় পত্রিকা 'আল-ওয়াফদ' ২০০১ সালের ২৬ ডিসেম্বর এক রিপোর্ট লিখেছিল, আফগান তালেবানদের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা তাদের জানিয়েছেন, ১৩ ডিসেম্বর তোরাবোরায় ওসামাকে সমাহিত করা হয় এবং তার জানাযায় ৩০ জন আল-কায়েদা যোদ্ধা ও পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের 'স্পেকটটর ম্যাগাজিন' ২০০১ সালে একজন মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তা ও পত্রিকার সিনিয়র অডিটর অ্যাঞ্জেলো এম কোডেভিলার (যিনি বোষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রফেসর) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রকাশ্যে ওসামার উপস্থিতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বস্তুতপক্ষে ওসামা ২০০১ সালে হঠাৎ করে মারা যান। ৯/১১ এর সত্য উদঘাটনের আন্দোলনের অন্যতম সদস্য ডেভিড রে গ্রিফিন 'ওসামা জীবিত না মৃত' শিরোনামে এক বই লিখেন। তাতেও তিনি প্রমাণ করেন ওসামা মারাই গেছেন। তিনি তার বইতে লিখেছিলেন, ২০০১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর ওসামা কিডনি রোগে মারা যান। ওয়াজিরিস্তান সীমান্তে তোরাবোরা পর্বতে তাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দফন করা হয়। এরপর ওসামার যে সব অডিও-ভিডিও টেপ প্রচার করা হয় তা সবই পশ্চিমাদের বানানো নাটক এবং ইরাক ও আফগনিস্তানে হামলা চালিয়ে যাওয়ার অজুহাতমাত্র। ২০০৯ সালে ৯/১১ বার্ষিকীতে লন্ডনের 'ডেইলি মেইল' পত্রিকার কলামিষ্ট সু রিড লিখেছেন, ৯/১১-এর পর আমরা ওসামার যেসব অডিও টেপ দেখেছি ও শুনেছি তার সবই ভুয়া প্রমাণিত হয়েছ। ওসামার প্রকাশিত টেপ ও ভিডিও সম্পর্কে গ্রিফিন বারাবার বলেছেন, ওসামার ভুয়া ভিডিও প্রকাশ বন্ধুপ্রতিম মুসলিম দেশগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার অজুহাতমাত্র। যাইহোক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তথা মুসলমানদেরকে বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখতেই পশ্চিমারা ওসামার আর একটি মৃত্যু আবিস্কার করল। এই অজুহাত দেখিয়ে তারা এখন পাকিস্তানে আগ্রাসনের হাত পাকাপোক্ত করবে। কারণ পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ওসামাকে এমন এক অবস্থানে হত্যার দাবী করা হয়েছে যেখান থেকে পাক সেনা প্রশিক্ষণকেন্দ্র অতি নিকটে। ফলে তারা সহজেই প্রমাণ করতে পারবে যে, অ্যাবোটাবাদের সেনাপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কাছাকাছি রেখে পাকিস্তান ওসামাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এটি পাকিস্তানের জন্য হয়ে গেল এক বিরাট দুর্বল পয়েন্ট। যাকে সামনে রেখেই সেখানে নির্বিচারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, পাইলটবিহীন বিমান হামলার মাধ্যমে মানবহত্যার নতুন লাইসেন্স পশ্চিমারা পেয়ে গেল। আর ভারত ও ইসরাঈল বারবার বলে আসছে যে, পাকিস্তান হল ইসলামী জঙ্গীদের আশ্রয়দাতা। তারা এখন আরো জোরেশোরে তা প্রচার করছে এবং তাদের সমরাস্ত্র ভাণ্ডার মজুত করছে। মোটকথা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক ওসামা বিন লাদেনের এই মৃত্যুকাহিনী পাশ্চাত্যের জন্য নতুন যুদ্ধক্ষেত্র অনুসন্ধানের পরিকল্পনায় একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রেক্ষাপট। একটি সুদূরপ্রসারী রণপরিকল্পনার অংশ হিসাবেই যে তারা এ ঘটনার জন্ম দিয়েছে তা সাদা চোখেই দৃশ্যমান।

পরিশেষে বলব, ওসামা বিন লাদেন যদি সত্যিই মৃত্যুবরণ করে থাকেন তার অর্থ এই নয় যে, পশ্চিমারা মুসলিম বিশ্বে তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ প্রত্যাহার করতে যাচ্ছে। বরং স্বার্থসিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমারা নিজেদের প্রয়োজনে আরো ওসামার জন্ম দেবে এবং জুজুর ভয় দেখিয়ে তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করেই যাবে। ফলে এ মৃত্যুতে আমেরিকার স্বার্থ পুরোপুরি উদ্ধার হলেও মুসলিম বিশ্বে এর কোনই প্রভাব পড়েনি। আমেরিকার এই রক্তাক্ত থাবার এ দৃশ্য ক্রমাগত দেখেই যেতে হবে যদি এই দানবের বিরুদ্ধে শতধাবিভক্ত মুসলিম বিশ্ব ঐক্যবদ্ধ না হয়। অতএব মুসলিম শাসকদের প্রতি আমাদের আকুল আহ্বান, আসুন বিধর্মীদের পায়রবী থেকে নিজেদের সর্বতোভাবে মুক্ত করি এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র শাসন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর বুকে ন্যায় ও কল্যাণের সুরভিত সমীরণ ছড়িয়ে দেই। নিজেদেরকে পরাধীনতার হাত থেকে বাঁচাই এবং বিশ্বমানবতাকে দাসত্বের কবল থেকে উদ্ধার করি। এক ও অভিন্ন ছায়াতলে একত্রিত হয়ে সকল মুসলমান পৃথিবীর যাবতীয় অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। তবেই এ পৃথিবী একদিন সত্যিকার বসবাসযোগ্য পৃথিবীতে পরিণত হবে। যুলুম, অন্যায়, অত্যাচার পরাভূত হবে এবং ন্যায় ও কল্যাণের আলোকমালায় সুশোভিত হয়ে উঠবে বিশ্বজাহান। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।

লেখক: সহ-পরিচালক, সোনামণি, রাজশাহী যেলা।

মুহিব্বুল্লাহ : এক খোদা ইনসান বান গিয়া

অনুবাদ : মাওলানা মিছবাহুদ্দীন

[বার্মায় জন্মগ্রহণকারী এই সাবেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর স্বলিখিত ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি তামিল ভাষা থেকে উর্দূতে অনুবাদ করেন মাওলানা রিয়ায মূসা। সেখান থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী ও মাওলানা মিছবাহুদ্দীন। ২০০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত বইটি তখনই আমাদের হস্তগত হয়। বইটির উল্লেখযোগ্য অংশ এখানে পাঠকের খেদমতে পত্রস্থ করা হল- নির্বাহী সম্পাদক]

বার্মায় এক বৌদ্ধ পরিবারে আমার জন্ম। থাইল্যান্ডে শিক্ষা গ্রহণ। পিতামাতার কামনা ছিল, আমি যেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতে পারি। ফলে তারা আমাকে থাইল্যান্ডের এক বৌদ্ধধর্ম শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি করেন। বয়স ছিল তখন আমার পাঁচ বছর। বৌদ্ধানুসারীদের ধারণা হল- ছেলেকে সন্ন্যাসী বানাতে পারলে পিতামাতার পাপ মোচন হয়ে যাবে। আমাকে যে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হল সেখানকার নিয়মনীতি এতই কঠোর যে, সেশনের শুরুতে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী ভর্তি হলেও শেষাবধি তাদের দু-পাঁচজনই অবশিষ্ট থাকে। আমার সহপাঠীদের মধ্যে আমরা মাত্র দুজন কোর্স সমাপ্ত করি। ছাত্রাবস্থায় একনাগাড়ে ১৫ বছর যাবৎ ২৪ ঘণ্টায় ২৫০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য ও শুধুমাত্র এক গ্লাস পানি দেওয়া হত। অবশেষে আমি উত্তীর্ণ হলাম ও বিশেষ এক পর্যায়ে গিয়ে বৌদ্ধগুরুদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আমাকে বৌদ্ধস্বামী বা ধর্মগুরু হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে আমি বিশ্বে স্বামী আনন্দ নামে পরিচিত হই। স্বামী হিসেবে মনোনীত হবার পর জাপান সরকারের পক্ষ হতে আমাকে একটি গ্রীনকার্ড দেওয়া হয়, যার মাধ্যমে আমি সৌদি আরব ব্যতীত সারা বিশ্ব বিনা খরচে ভ্রমণ করতে পারতাম। আমার সম্ভাব্য যাত্রার জন্য জাপানী ফ্লাইটগুলোতে একটি সীট সবসময় রিজার্ভ রাখা হত। আমার যাত্রা নিশ্চিত হওয়ার সংবাদ বিমানবন্দরে পৌঁছে গেলে ২০ মিনিট অবধি বিমান দেরীতে ছাড়ত। সৌদি সরকার ভিসা না দেওয়ায় সে দেশ ছাড়া গোটা বিশ্ব আমি তিনবার ভ্রমণ করেছি। বার্মাতে শিক্ষা গ্রহণের সময় আশ্রমে যে সমস্ত বিষয়াদি গুরুত্ব পেয়েছিল, তার অন্যতম হল–সমস্ত ধর্ম নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা। বিশেষভাবে ইসলাম আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু থাকত। বলা হত যে, গৌতম বুদ্ধ শতবার জন্মগ্রহণ করেন এবং শেষবার তিনি গাভীপৃষ্ঠে আরোহণ করে আসেন। এই সেই গাভী যা মুসলমানদের জন্য প্রতিনিয়ত জবাই করা হচ্ছে, অথচ সেটা আমাদের কাছে পূজনীয়। সেজন্য মুসলমান হতে সাবধান থাকতে হবে। কেননা তারা আমাদের প্রধানতম শত্রু। একথাও শিক্ষা দেওয়া হত যে, মুসলমানদের নবী (ছাঃ) এমন যাদু জানতেন যে, সেটা পড়ে যার উপরে ফুঁক দিতেন সে তার বশীভূত হয়ে যেত। তাই ওদের থেকে খুব সর্তক থাকতে হবে। অতঃপর আমি ৪৫ বছরে কোন মুসলমান দেখিনি। ২০ বৎসর বয়সে যখন আমি সার্টিফিকেট পাই তখন আমার ওযন মাত্র ৪৫ কেজি। প্রশংসাপত্র নিয়ে আমি আমাদের প্রধান ধর্মগুরুর আশীর্বাদ গ্রহণ করার জন্য অস্ট্রেলিয়া যাত্রা করি। তিনি তখন আশ্রমের পঁয়ষট্টিতম তলায় অবস্থান করছিলেন। অনেক বাধা অতিক্রম করে সেখানে পৌঁছে দেখি গুরুর সম্মুখে রকমারী খাদ্যসম্ভার, মাছ, মাংস, ডিম, ফল-মূল ছাড়াও বহুমূল্যবান মদের বোতল সাজানো আছে। আনুমানিক ১২০ কেজি ওযন ধর্মগুরুর পার্শ্বে কয়েকজন যুবতী তার সেবায় নিবেদিত রয়েছে। আমি এসব প্রত্যক্ষ করার পর ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিতেই তিনি বসতে বললেন। পরে এক গ্লাস মদ দিয়ে তিনি তা পান করার নির্দেশ দিলেন। যেহেতু আমি কোনদিন মদ খাইনি সেহেতু ভয় পেয়ে অসম্মতি জানালাম। তিনি বললেন, 'না খেলে তুমি স্বামী হতে পারবে না।' তিনি জোরপূর্বক আমাকে পান করালেন। ফলে আমি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ি। কখন আমার জ্ঞান ফিরেছিল তা আমার মনে নেই। এভাবে আমার নবজীবনের সূত্রপাত হল। ২৯ কেজি ওযন হতে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি ৯০ কেজিতে রূপান্তরিত হই। ভগবান গৌতম বুদ্ধের অবতার সেজে এভাবে আমার জীবনের ৪৫ বছর কেটে যায়। মানুষ আমার পায়ে কুর্ণিশ করতে লাগল ও আমাকে ভগবান বলে বিশ্বাস করতে লাগল। আমিও নিজেকে মনে মনে ভগবান বুদ্ধের অবতার হিসেবে ভাবতে আরম্ভ করলাম। আমার ধারণা ছিল যে আমি যা বলি তা ভগবানেরই কথা। জাফরানী রঙ এর পোষাক ও রেশমবস্ত্র পরিহিত প্রতিটি বৌদ্ধ ভিক্ষুর ধারণা এটাই, শুধুমাত্র আমার একার নয়। বিশ্বের ধর্মগুলির অন্যতম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। এই ধর্মের বার্তাবাহক হয়ে আমি মাঠে নেমে পড়ি। সারা বিশ্বে আমার অজস্র শিষ্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আমার পদধূলি ও আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য লোকেরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। আশীর্বাদের প্রণামী ছিল এক লক্ষ এক টাকা মাত্র। তারা আমার পদদ্বয় ধৌত করে পানি পান করত ও শুয়ে গেলে তাদের মাথায় এক মিনিট পা রেখে দিতাম। এভাবেই আশীর্বাদ পর্ব শেষ হত।

এমনিভাবেই একদিন সিঙ্গাপুরের এক ধনকুবের তার স্ত্রীকে নিয়ে আমার কাছে হাজির হল। বিবাহের পর পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তাদের কোন সন্তান জন্মেনি। তাই আমার আশীর্বাদ প্রয়োজন। বিনিময় তারা আমার দ্বারা নির্মীয়মাণ ইমারত যেটা আমেরিকার লস এঞ্জেলসে নির্মিত হচ্ছিল সেই আশ্রমের দুটি তলা বানিয়ে দেবার প্রস্তাব দিল। আমি বললাম দু'তলা নয় পাঁচটি তলার খরচ দিতে হবে। তারা তাতেই সম্মত হয়ে গেল। তাদের বললাম, আজকে সন্ধ্যার পর একটি মাদুলি দিব। কথামত একটা মিথ্যা মাদুলী তাদের হাতে ধরিয়ে দিলাম এবং বললাম রাতে বালিশের নীচে মাদুলীটিকে রেখে ঘুমাবে। যদি গৌতম বুদ্ধ তোমাদের সঙ্গে কথা বলেন তাহলে আমার কাছে আসবে। তারা খুব সকালে এসে বলল, হ্যাঁ আজ রাতে ভগবান বুদ্ধ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি মনে মনে বললাম সারাজীবন তপস্যা করেও ভগবান বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেলাম না, আর তারা নাকি একদিনেই সাক্ষাৎ পেয়ে গেল। আমি প্রস্তাব দিলাম মহিলাটিকে নিরীক্ষণের জন্য চারমাস আমার কাছে রাখতে হবে, তাহলে ওর সন্তান হতে পারে। তারা সাগ্রহে এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে মহিলাটিকে আমার কাছে রেখে যায়। এর ফলে আমার মাধ্যমে মেয়েটি পরপর দুটি সন্তান জন্ম দেয়। ব্যাস। সারা বিশ্বে প্রচার হয়ে গেল স্বামী আনন্দ সন্তান দিতে পারেন। অবশ্য আপনারা এ প্রশ্ন করবেন না যে– ঐ সন্তানগুলি কার ঔরসের?

যে কোন আশীর্বাদ যদি ঘটনাক্রমে প্রতিফলিত হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করা হত যে, স্বামী আনন্দের আশীর্বাদে অমুক কাজটা হয়েছে। আর কোন আশীর্বাদ প্রতিফলিত না হলে ব্যাখ্যা দেওয়া হত যে, ভগবান গৌতম বুদ্ধ তাদের প্রতি এখনও সন্তুষ্ট নন, সেজন্য আশীর্বাদ কার্যকরী হয়নি।

দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত বহু লোক আরোগ্য লাভের আশায় আমার মূত্রপান করত। আমার মূত্রপানে অসুবিধা কি? আমি তো তখন সাক্ষাৎ

ভগবানই হয়েছিলাম। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী আমার কাছে তিনবার আশীর্বাদ নিতে এসে মোট পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। জার্মানীতে একদিন সভা চলছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে প্রশ্ন করল, গুরুজী আমার সন্তান কটি? আমি বললাম 'তিনটি'। তখন সে আমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলল, গুরুদেব আমার সন্তান তো ছয়টি। আমি বিচলিত হয়ে উর্ধ্বমুখী বসে কিছুক্ষণ ধ্যানের ভান করে পরে বললাম, তুমি ঠিক বলেছ, তবে ছয়টি সন্তান এই জন্মে নয়। তোমার তিনটি সন্তান প্রথম জন্মের ও অপর তিনটি পরের জন্মের। সে লোকটি মহানন্দে বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে প্রশ্ন করল এই বলে যে, তার কোন সন্তানগুলি প্রথম জন্মের আর কোনগুলি পরের জন্মের? এই ঘটনার পর আমার চিন্তা হল যে, এভাবে যদি আমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত হতে থাকে তাহলে তো লোকদের আস্থা কমে যাবে। তখন হতে বৌদ্ধ সোসাইটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, স্বামী আনন্দ সরাসরি জনগণের সাথে কথা বলবেন না। ঘোষণা দেওয়া হল যে, স্বামী আনন্দ এখন গৌতম বুদ্ধের সাথে সংলাপ করছেন। সুতরাং তিনি কোন পাবলিকের সাথে কথা বলবেন না।

জীবনের মোড় পরিবর্তন :

এক সময় আমি দু'বার কুরআনুল কারীম পড়ার সুযোগ পেলাম। এতে আমার মনের বদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। আমার মনে হতে লাগে বিগত পঁয়ত্রিশ বছর আমি সোজাপথ হারিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে আছি। এই উপলব্ধি আসার পরও এই বিলাসবহুল জীবনের মোহ ত্যাগ করে আসা ছিল আমার জন্য তখন অকল্পনীয় ব্যাপার। এমতবস্থায় নিম্নবর্গের এক ধনী নেতা তার ব্যবসায়িক উন্নতির জন্য আশীর্বাদ প্রার্থী হল এবং তাতে সে সফলকাম হলে সে আমাকে প্রচুর অর্থ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। আমি তাকে ১২০ বছর বেঁচে থাকার ও প্রচুর লাভবান হওয়ার আশীর্বাদ দিলাম। ঘটনাক্রমে সে মাত্র নব্বই দিনের মাথাতে মৃত্যুবরণ করে। তার অনুগামীরা একদিন সকালে এসে সংবাদ দিল যে, 'আপনি যাকে ১২০ বৎসর বাঁচার আশীর্বাদ করেছিলেন সে মারা গেছে। এখন ওকে পুড়িয়ে সৎকার করব না কবর দিব?' আমি বললাম, 'এর উত্তর নিতে হলে কুড়ি হাজার টাকা প্রণামী দিতে হবে।' তারা তাই করল। আমি তাদেরকে বললাম 'ওকে পুড়িয়ে সৎকার কর'। কেননা আমার শংকা ছিল যে, পোস্টমর্টেম হলে আমিও জড়িয়ে যেতে পারি।

১৯৯১ সালে কাঁচির শংকরাচার্য্যের নিকট প্রয়াত রাজীব গান্ধী আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য যান। শংকরাচার্য্যজী প্রধানমন্ত্রীর মাথায় পা রেখে আশীর্বাদ করে বলেন, 'তুমি একশত এক বৎসর বাঁচবে ও আমৃত্যু তুমিই প্রধানমন্ত্রী থাকবে।' এই আশীর্বাদের মাত্র সাতাশ দিনের মাথায় এল.টি.টি.ইর গুলিতে রাজীব গান্ধী মারা যান। এই দুই ঘটনা আমার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আমি যাকে ১২০ বছর বাঁচার আশীর্বাদ করলাম সে মারা গেল নব্বই দিনের মাথায়, আর স্বামী শংকরাচার্য্য যাকে ১০১ বছর বাঁচার আশীর্বাদ করলেন সে মারা গেল মাত্র সাতাশ দিনের মাথায়। তাহলে আমরা দু'জনেই মিথ্যুক। এর চেয়ে অপমানের আর কি আছে? আমাদের কথার কোন মূল্য নেই। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ কোন ক্ষমতার অধিকারী নয়। বিশ্বে শুধু একজন স্রষ্টারই আদেশ ও ইচ্ছা কার্যকরী হয়। এই বোধোদয় আমার বিশ্বাসের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে ও বিবেক বলতে থাকে যে, আমার মত তুচ্ছ ব্যক্তির আশীর্বাদ দেওয়ার নৈতিক কোন অধিকার নেই। এই ভাবাবেগ হৃদয়ে জাগ্রত হতেই অজ্ঞাতসারে আমার শরীর হতে ধর্মগুরুর পোষাক খসে পড়তে থাকে এবং মনের মধ্যে শক্তভাবে এই বিশ্বাস গুঞ্জরিত হতে থাকে যে, এক সৃষ্টিকর্তা ছাড়া উপাসনার যোগ্য কেউ নেই।

সিঙ্গাপুর হতে একদিন জার্মানী যাচ্ছি। এমতাবস্থায় দেখি আমার পেছনে দু'জন মুসলমান বসে আছে। তাদের কাছে ছিল ১০ লিটার করে পানির জার। আমার রাগ হল ও মনে মনে বললাম, এরা বোকা জাত নইলে সিঙ্গাপুর হতে ইলেকট্রনিক দ্রব্যাদির পরিবর্তে পানির ক্যান নিয়ে যাচ্ছে। ওদের দেশে কি পানি নেই? বিমানে বসে দেখলাম ওরা একটা ছোট গ্রন্থ বের করে পড়ছে। ব্যাস! ছাত্র জীবনের কথা মনে পড়ে গেল যে, ওদের নবী মুহাম্মদ (ছাঃ)। যে ব্যক্তি মন্ত্র পাঠে লোকদের বশীভূত করত। মনে হয় এরাও আমাকে বশীভূত করার জন্য সেই গ্রন্থ পড়ছে। এই ভয়ে আমি আমার সঙ্গীর সীটে সরে গেলাম। জার্মান বিমানবন্দরে অবতরণের পর তাদের সঙ্গে কথা বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা পানি বহন করছেন কেন? কত ভাল ভাল দ্রব্যাদি ছেড়ে পানি বহন করছেন, আপনাদের দেশে কি পানি নেই?' তাঁরা বললেন, 'সংক্ষিপ্ত সময়ে এই পানির বৃত্তান্ত বলা সম্ভব নয়। এটা সাধারণ কোন পানি নয়। যমযম কূপের পানি। আপনি নিজের বাসার ঠিকানা দিন অথবা আমাদের ঠিকানায় আসুন। আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ আপনাকে জানাব। আমি আমার কৌতূহল চাপতে পারলাম না। তাই একদিন তাদের বাসায় গিয়ে সকাল ন'টা হতে রাত্রি নটা পর্যন্ত যমযম কূপের উৎপত্তি ও তার মাহাত্ম্যের কথা বিস্তারিতভাবে শুনলাম। তারা বললেন, 'অতিরিক্ত কিছু শোনার ইচ্ছা থাকলে অপেক্ষা করুন, আগামীকাল পাকিস্তান হতে দু'জন বিশেষজ্ঞ আলিম আসছেন, তারা আরও তথ্য দেবেন।' তাঁরা যেসব তথ্য আমাকে দিয়েছিলেন তার মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকরা চিন্তা করল যে, যমযমের প্রতি মুসলমানদের যে বিশ্বাস অর্থাৎ তা পবিত্র ও তাতে অনেক উপকার আছে–এটাকে নস্যাৎ করতে হবে। যদি ঐ পানির উৎসকে শেষ করে দেওয়া যায় তাহলে এটা সহজেই হবে। কিন্তু কাজটা তো সহজ নয়, সেজন্য তারা সৌদি সরকারকে বোঝালো যে, কূপটি আদিকালের। এর সংস্কারের প্রয়োজন আছে। দীর্ঘদিনের জমে থাকা আবর্জনা দূরীভূত হলে পানি আরও পরিষ্কার হবে। এতে সরকার রাজী হয়। সেই মোতাবেক আমেরিকা হতে চারটি শক্তিশালী পাম্প মেশিন এনে ৩/৪ ইঞ্চি পাইপ দ্বারা পানি উত্তোলন শুরু করল। সপ্তাহকাল ধরে পানি উত্তোলনের ফলে মক্কায় প্লাবনের সৃষ্টি হল। কিন্তু পানির বেগ এক ইঞ্চিও কমল না । অবশেষে তারা এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে।

আমি স্বামী থাকা অবস্থায় একজন মুসলিম ভাই ও আমার এক বৌদ্ধ ছাত্র ডাঃ চিরাপ্পান (মাদ্রাজ)-এর দ্বারা আমার ইসলামের সাথে পরিচয় ঘটেছিল। তাঁরা আমাকে ইসলামের উপর লিখিত বই-পুস্তক দেন। আমি কিন্তু সেগুলি মনযোগ দিয়ে পড়িনি। কিন্তু এসকল ঘটনা আমাকে কুরআন ও মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনী পুণরায় পড়তে উৎসাহিত করল। আমি যতই পড়তে লাগলাম ততই আমার মনে অতীতের কৃত অন্যায়ের অনুভূতি জাগ্রত হতে লাগল। পরিণামে ভগবানের স্থলাভিষিক্ত এই আমি ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষে রূপান্তরিত হতে থাকি। ব্রহ্মচারী (যেটা মূলত ধোঁকা) হতে নিজেকে পিতা ও স্বামীর আসনে এনে উপস্থিত করি। যে আমি অন্যকে তথাকথিত পথপ্রদর্শনকারী ছিলাম আজ নিজেই আমি সত্যপথের জন্য হন্যে হয়ে বেড়াতে থাকি। অবশেষে আমি এক আল্লাহর সম্মুখে আত্মসমর্পণ করি। সংক্ষিপ্তসার এই যে, আমি এর আগে ভগবান ছিলাম এখন মানুষ হয়ে গেছি।

আমার অর্থহীন জীবনের কিছু নিদর্শন :

'বুদ্ধম শরনম গচ্ছামি, ধরনাম শরনম গচ্ছামি, সংগম শরনম গচ্ছামি' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধকে স্মরণ করাই আমার ধর্ম, সেই ধর্ম স্মরণ করাটাই আমার কর্ম ও সেই ধর্মে মিলিত হওয়াটাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। এই নিয়মের উপরেই আমার জীবন যাত্রা। উপরে বর্ণিত মন্ত্র জপ করা

ও বোধি গাছের নিচে বসে শিক্ষাগ্রহণ ও তার প্রচার করাটাই চিল আমার বৌদ্ধ জীবনের মূল লক্ষ্য।

গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে আমার ধারণা :

আমাকে শিখানো হয়েছিল যে, মানুষকে মানুষের দাসত্ব হতে মুক্ত করতে, অসভ্যতা ও বর্বরতাকে নির্মূল করতে এবং আর্য্য সম্প্রদায়ের অত্যাচার বন্ধ করে মানুষকে নিরাপত্তা বিধান ও শান্তি দিতে যিনি এসেছিলেন, তিনি হলেন গৌতম বুদ্ধ। কিন্তু কে তিনি? মানুষ? মানুষ কি স্বয়ং জন্মেছে? না তার সৃষ্টিকর্তা কেউ আছে? মৃত্যু কেন আসে ও মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়? এ ধরনের বহু প্রশ্ন আমার বিবেককে জর্জরিত করতে থাকে। হারিয়ে যাওয়া বস্তু খোঁজার ন্যায় আমি এগুলির উত্তর খুঁজতে থাকি। পরিণামে দুনিয়ার প্রতি আমার মোহ কাটতে থাকে। আমি সত্যের খোঁজ করতে থাকি। মনে দয়া, ভালবাসা ও নম্রতা যা অর্থ দ্বারা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়, তা আমার মনে স্থান করে নিতে থাকে। আমার নিজের চলার পথ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও বিভিন্ন ধর্মকে নিয়েও আমি পর্যালোচনা করতে থাকি।

আমার পূর্বপুরুষদের বসতভিটা তামিলনাডু জেলার রামনাথপুরম পারামকুন্ডির নিকট আলকানকুলাম গ্রামে ছিল। পরে সিদ্ধার কুট্রাই বন্দর দিয়ে নৌকা দ্বারা বার্মা পৌঁছে আমার দাদা বসবাস আরম্ভ করেন। আমি এক বৌদ্ধগৃহে জন্মলাভ করি। আমি স্বামী আনন্দজী হলেও আমার আত্মীয়-স্বজনরা গবাদিপশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। জীবিকার খোঁজেই তারা বার্মা এসেছিলেন। আমাদের মাতৃভাষা ছিল তামিল। আমার পিতামাতা আশৈশব বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। সেহেতু তারা আমাকে বৌদ্ধধর্মের অনুসারী করে তোলেন। আমাকে বৌদ্ধভিক্ষু করার মানসে বিভিন্ন বৌদ্ধ মন্দিরে আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। রেংগুন, তিব্বত, চিন, গোরবা, কম্বোডিয়া, জাপান ইত্যাদি দেশের বৌদ্ধগুরুদের নিকট আমি শিক্ষাগ্রহণ করি। আমার এই শিক্ষা সমাপ্ত হয় ১৯ বছর বয়সে। বার্মার দ্বিতীয় রাজধানী মান্ডেলায় বৌদ্ধগুরু 'চানীশর' এশিয়ার পাঁচ বৌদ্ধগুরুদের একজন রূপে আমাকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। অতঃপর আমাকে জাফরানী পোষাক পরিধান করানো হয় ও বৌদ্ধগুরু বোদীদাসওয়াদাস নাগাসাকীতে আমাকে রেখে সারাবিশ্বে এই ধর্ম প্রচারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। অতঃপর ১০১ জন ধর্মগুরু আমাকে নেতা নির্বাচন করেন। আমি তারপর ধর্মপ্রচারে নিজেকে নিয়োজিত করি। এশিয়া মহাদেশের ১৭টি দেশে যেখানে বৌদ্ধধর্ম আছে সেখানে ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে আমি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতে থাকি। এতে আমি প্রভূত সম্মানের অধিকারী হই। আমার আপন ভাই স্বামী নন্দনজী আচার্য্য আমেরিকার লস এঞ্জেলসে ৬৭ তলা আশ্রমের মঠপতি হয়ে বসে আছেন। সেখানে আমিও সাড়ে তিন বছর আধিপত্য চালিয়েছি। কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ইসলাম আমাকে ঘিরে ফেলল। মুসলমানদের সাথে আমার সম্পর্ক নিগূঢ় হতে থাকল। ছোট ছোট পুস্তিকা পাঠ ও নবী (ছাঃ)-এর জীবনীপাঠ ও সর্বোপরী কুরআন পাঠে ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকল। ফলে এই বিশ্বাস আমার বদ্ধমূল হল যে, সৃষ্টিকর্তা একজনই ও তাঁরই নির্দেশে সূর্য উদিত হচ্ছে ও অস্ত যাচ্ছে। এই উপলব্ধির পরে তার বিশাল জগৎ সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে আমি বিস্ময়াভূত হয়ে পড়ি ও ইসলামের নিকটবর্তী হয়ে পড়ি। অতঃপর কুরআনের পুনর্পঠন আমার বৃদ্ধি পেতে থাকে ও মন্দিরের দৈনন্দিন কাজে আমার অনীহা বাড়তে থাকে। ফলে সকাল-সন্ধ্যা মোমবাতী জ্বালানো, পানিতে ফুল দেওয়া ও মন্ত্রপাঠ বন্ধ হয়ে যায়।

মানুষ কি খোদা ?

আমি কি খোদা? একথা চিন্তা করতে ইসলাম আমাকে বাধ্য করেছিল। মানুষ তার জৈবিক চাহিদা অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে এটাই তার দায়িত্ব। একজন পুরুষ সামর্থ্য অনুযায়ী চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারে-এ অনুমতি ইসলামে আছে। কিন্তু বৈবাহিক জীবন বর্জন করে মানুষ শত শত নারীর সঙ্গে দৈহিক মিলন ঘটিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে নারীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে এটা বিরাট অন্যায়। এ পাপ হতে ইসলাম আমাকে রক্ষা করেছে। আমি আমার খোদায়ী ছুঁড়ে ফেলে আজ মানুষ হয়ে গেছি।

গুরু ও তার অভিশাপ

আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদটা আগুন লাগার মত সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল। তিব্বতের স্বামীজীর নিকটেও সংবাদ পৌঁছল। তিনি সর্বদা আমার প্রশংসা করতেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি শুধুমাত্র স্বামী নন তিনি একজন দক্ষ যাদুকরও ছিলেন। আমি তার ডাকে উপস্থিত হয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করলাম। তিনি বললেন, 'আপনার ইসলাম গ্রহণে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষতি সাধন হয়নি। বরং অসংখ্য জনগণ যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের জন্য ইচ্ছা করেছিলেন তাদের জন্যও আপনি বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করুন।' আমি বললাম, 'আর কোন অবকাশ নেই।' এত বলিষ্ঠ জবাব আমি দিতে পারব, এটা আমার চিন্তাতেই ছিলনা। ইতিপূর্বে তার কথার প্রতি আমার এমন অবিচল বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যদি বলতেন, 'খরগোশের তিনখানা পা হয়, তাহলে আমি বলে দিতাম গুরু যা বলছেন তাই ঠিক। গুরুজী আমার ওপর রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন যে, তার কথা অমান্য করার অপরাধে ১৫০ দিনের মধ্যে আমার এক পা ও একহাত পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হবে। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার অভিশাপের কথা মনে করতেই মন শিউরে উঠত। অথচ তার ওই বদদো'আ আমাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করল না। এ ধরনের বাজে কথার ইসলামে কোনই ভিত্তি নেই। শয়তান মনে দুর্বলতা আনার চেষ্টা করলেও আমি আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা রেখে তথা হতে প্রস্থান করি। অতঃপর আমি খুব সতর্কতার সাথে এই জন্য চলাফেরা করতাম যে, কোন অঘটন ঘটে গেলে যেন লোকদের বলার সুযোগ চলে না আসে যে এটা অভিশাপের পরিণতি। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে সুস্থভাবে ১৫০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেল। আমি তখন মক্কাতে আছি। সমস্ত প্রশংসার যোগ্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। বহু মানুষ এ ধরনের অভিশাপে পড়ে নিজেদের জীবন নষ্ট করে ফেলে। আল্লাহ আমাকে বিপদের অবস্থাতে রক্ষা করেছেন। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণকারী অন্য কারও জন্য প্রতারক হতে পারেন না। বৌদ্ধভিক্ষু থাকাবস্থায় শত সহস্র লোককে প্রতারণা করেছি। আমি ও আমাদের গুরুদের হাতে প্রতারণার শিকার হয়েছি। ইসলাম গ্রহণের পর সবকিছু বন্ধ হয়ে গেল। জাফরানী পোষাক আমার মনে যে অহমিকার সৃষ্টি করত ইসলাম তা নিঃশেষিত করে দিয়েছে। আমার মন কোমল হয়ে গেছে। ১৯৯৩ সনের ১৩ই অক্টোবর চেন্নাই (মাদ্রাজের) মসজিদে মা'মূরে কালিমায়ে তাওহীদের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করি ও স্বামী আনন্দ হতে মুহিব্বুল্লাহ (আল্লাহ প্রেমিক) হয়ে যাই। আশা করি আল্লাহ আমার পূর্বের পাপ ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইসলাম গ্রহণ করলে গ্রহণকারীর পূর্বের পাপ মাফ হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট সমস্ত মানুষই সমান। এই সমঅধিকারের প্রকৃত স্বাদ আমি অনুভব করছি। আজ হতে সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মসজিদে প্রবেশ করার অধিকার আমি অর্জন করেছি ও যে কোন মসজিদে যে কোন মুসলমানের সাথে ছালাত আদায় করতে আমাকে পৃথিবীর কোন শক্তি বাধা দিতে পারবে না। ইসলাম গ্রহণের দিন হতেই আমার মানসপটে এ বাসনা জাগ্রত হয় যে, আমি মানুষে মানুষে ভালবাসা ও প্রেম-প্রীতির পাঠ দিয়ে বেড়াব। এতদুদ্দেশ্যে অধিক জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামে চিদাম্বরম জেলা কায়েল-পাটনামের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে অবস্থানকালীন গভীরভাবে জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করলাম ও সিদ্ধান্ত

নিলাম যে, আমার জীবনের লক্ষ্য হল নিজের ঈমানকে সুদৃঢ় করা এবং ইসলামকে অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া ও সাম্যবাদের সঠিক চিন্তাধারা মানুষের কাছে তুলে ধরা। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে বহু ভুল ধারণা ছিল। আমার মত ভুলের শিকার হয়ে অজস্র মানুষ ইসলামের নেয়ামত হতে বঞ্চিত আছে। আমাদের উচিত মানুষের মধ্য হতে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটানো, ইসলামের সাম্যবাদকে তুলে ধরা ও তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। আমাদের সংগঠিত হতে হবে ও ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাহলে দেখা যাবে, শত শত গ্রাম ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে নিয়েছে।

নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) সম্পর্কে আমার উপলব্ধি :

মানবেতিহাসের অমর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ চরিত্রের যদি কেউ থেকে থাকেন তাহলে তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ (ছাঃ)। তাঁর আত্মজীবনীমূলক বই কম করে হলেও দশখানা পড়ার সুযোগ হয়েছে আমার জীবনে। বিপ্লব এনেছে এই জীবনচরিত পাঠ। যে কেউ তাঁর জীবনকথা গভীরভাবে অধ্যয়ন করবে সে তার জীবনের অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলি অনুভব করতে পারবে। তিনি যেভাবে জীবন অতিবাহিত করেছেন সেভাবে চলার মত লোক দ্বিতীয়জন পাওয়া যায়নি ও যাবেনা। এছাড়া তিনি অসাধারণ গুণাবলীর সমন্বয়কেন্দ্র ছিলেন। স্বীয় ঈমানে পর্বততুল্য অবিচলতা, দ্বিধাহীন ও আপোষহীন তাওহীদে বিশ্বাসী। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভেদাভেদহীন সাম্যবাদী। অতিথিপরায়ণতা, দয়াপরবশ হওয়া ও সহানুভূতিপ্রবণ ব্যক্তিত্বের তিনি মহাধিনায়ক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও তিনি শত্রু-মিত্র সকলের নিকট সমান প্রশংসিত। মানবজীবনের জন্য এত সহজ ও সরল নীতি তাঁর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে যা অন্যের দ্বারা আর কখনও সম্ভব বলে মনে হয় না। বিশ্বে এ যাবৎ যত মনীষী খ্যাতি লাভ করেছেন তাদের জীবনেতিহাস ও নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবনকে তুলনামূলক স্টাডি করুন তাহলে আপনার নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মুহাম্মদ (ছাঃ) অতুলনীয়। মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত তিনিই উত্তম মডেল বা আদর্শ হয়ে থাকবেন ইনশাআল্লাহ। এই মহান ব্যক্তি কিভাবে স্বীয় জীবন যাপন করেছেন ও অন্যের সাথে তাঁর আচার-ব্যবহার ও তাঁর ব্যবহারিক জীবন কেমন ছিল– এসবকিছু প্রমাণসহ অধ্যয়ন করেছি। নবীরূপে বরিত হওয়ার পূর্বে ৪০ বৎসরের জীবন কলুষমুক্ত ও অনুকরণীয় ছিল। প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিছিন্নভাবে কিছু ভাল গুণ থাকে। কিন্তু সর্বগুণের সমন্বয় সাধিত হয়েছিল নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর ব্যক্তিত্বে।

খৃষ্টজগৎ তথা ইসলামবিদ্বেষীদের মিথ্যাচার হল যে, ইসলাম তরবারী দ্বারা প্রচারিত হয়েছে। এর উত্তরে সরোজিনী নাইডু লন্ডনে নিজের এক ভাষণে বলেছিলেন, 'ইসলাম অন্য ধর্মের অনুগামীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ায় না'। মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর অনুসারী ছাহাবীগণ ও তাঁদের অনুগামীরা সিসিলি পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন, আটশত বৎসর খৃষ্টানদের দেশ স্পেনে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তারা কখনও সাধারণ লোকের পূজা-পাঠ ও উপাসনাতে হস্তক্ষেপ করেননি। বরং খৃষ্টজগৎ তাদের মর্যাদা পেয়েছে। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা হয়েছে ও সম্মানের সাথে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা তাদের কুরআন শিক্ষার ফসল তা স্বীকার করতেই হবে। সালাহুদ্দীন আইয়ূবী সম্পর্কে ফ্রান্সের বাদশাহ বলেছিলেন, "আমি সালাহুদ্দীনকে নিয়ে আশ্চর্য হই যে, তিনি কিভাবে এত ভাল মানুষ হলেন। তাঁর উপর তো কোন চাপ ছিল না। আমার বিবেক কিন্তু মুসলমান হওয়ার জন্য কথা বলছে।" থাক্স্ আরনল্ড বলেছিলেন, "বিশ্বের যত ধর্ম আছে তার মধ্যে ইসলামই এমন একটা ধর্ম যার মধ্যে সমস্ত উন্নত গুণাবলী বিদ্যমান। সাধারণ লোকের দাওয়াত ও তাবলীগে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছে। অর্থলোভ দেখিয়ে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে এমন কোন ইতিহাস নেই। কুরআনের আলোকে মূল উৎস হিসাবে বরণ করে অসংখ্য মুসলিম বণিক সেই আলো দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করেছেন। পণ্ডিত সুন্দর লালা বলেছেন, 'মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মুহাম্মাদ (ছাঃ) যে ব্যবহার তার শত্রুদের প্রতি দেখিয়েছেন, তা ইতিহাস কোনদিন ভুলতে পারবে না। যারা সারা জীবন অন্যায়-অত্যাচার, অপমান- অপরাধ করেছিল তাদের সেদিন নিঃশর্ত ক্ষমা করে বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে তিনি চির অম্লান হয়ে থাকবেন।' ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেছেন, মুসলিমগণ মুক্তচিন্তা-চেতনার ধারক ছিলেন। যদি তারা অত্যাচারী হতেন তাহলে দীর্ঘ সময় ধরে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য ভূখণ্ডে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারতেন না। তারা ভারতসহ সমগ্রদেশের জনসাধারণের হিতাকাঙ্খী ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন ধর্মের উপর তারা কোন সময় হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁদের মতাদর্শ গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করেননি। অমুসলিম নাগরিকদের সাথে তাঁদের ব্যবহার, দয়া, অনুগ্রহ ও সহানুভূতির ব্যবহার ছিল।' আমি নিয়মিত কুরআন পাঠকালে আমার অন্তরাত্মা জাগ্রত হয়। আমি স্বস্তি পেতে থাকি। আল-কুরআন এমন এক ধর্মগ্রন্থ যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যার যুক্তিগ্রাহ্য জ্ঞান আমাকে আমার আলো দেখাচ্ছিল। আমি একজন পুরোহিত হওয়ার সুবাদে আমার নিজস্ব ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি।

গৌতম বুদ্ধ ও তার বৌদ্ধধর্ম :

যিশুর জন্মের পাঁচশ তিয়াত্তর বৎসর পূর্বে ভারতে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) জন্মগ্রহণ করেন ৫৭০ খৃষ্টাব্দে। খৃষ্টপূর্ব ৬৩২ অব্দে গৌতম বুদ্ধ ২৯ বৎসর বয়সে বৌদ্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হন। কাশী নদী হতে উত্তরে ২ কিমি দূরে অবস্থিত সারনাথে আর্যদের তৈরী 'বর্ণাশ্রম' প্রথার বিরুদ্ধে নিজস্ব ভাষণ প্রদান করেন। ৪৫ বৎসর বয়সে দক্ষিণ ভারতে মূর্তিপূজার নামে, ভগবানের নামে নির্দয়ভাবে পশুবলির বিরুদ্ধে সরব হন।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি :

(১) মিথ্যা বলবে না। (২) ব্যভিচার করবে না। (৩) নেশাদ্রব্য ব্যবহার করবে না। (৪) অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী হবে। (৫) পাপ হতে দূবে থাকবে। (৬) মূর্তিপূজার বিরোধী হবে।

এসবের জন্য গৌতম বুদ্ধ জীবনের সিংহভাগ ব্যয় করেন ও অযোধ্যা হতে ২৫০ কিমি দূরে অবস্থিত খুশীনগরে ৮২ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তার ভাষা ছিল 'পালী'। পরবর্তীকালে 'বুদ্ধ' নামে একখানা বই লেখা হয়েছে।

বুদ্ধ মানুষের মতই জন্মগ্রহণ করেন। পরে বিবাহিত হন ও শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যান। ন্যায়ের জন্য স্বীয় জীবনকে উৎসর্গ করেন ও মৃত্যুবরণ করেন। অথচ তার মৃত্যুর পরে তাকেই তাঁর ভক্তবৃন্দ ভগবান বলে মেনে নিতে থাকেন। তিনি একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি আর্য নীতি ও শাস্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর ধর্মে আর্যদের আদর্শ অনুসারীরা অনুপ্রবেশ করে। যার প্রভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। ১) মহাযান। ২) হিনযান। আর্যদের ধূর্তামি ও চাতুর্যের কারণে তাদেরকে ভারত হতে বিতাড়িত হতে হয়। সে সময় নাগাপট্টনামে আর্য ব্রাহ্মণরা হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। বর্তমানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি নিয়ে বৌদ্ধগণ নিজ ধর্ম পালন করে চলেছেন। মহাযানরা তিব্বতে, হিনযানরা বার্মা, শিলং ও থাইল্যান্ডে, জাম্বুতরা জাপানে এবং কোরিন বুতরা উত্তর বার্মাতে বসবাস করছে।

ভারতে থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বৌদ্ধগণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। ভারতে বৌদ্ধগণ বর্ণাশ্রমের শিকার হয়ে আছেন। শিলং-এ বৌদ্ধগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তারা জাত-পাতের দ্বন্দ্বে বন্দী ছোট জাতের জন্য পৃথক বৌদ্ধ বিহার ও উঁচু জাতের জন্য পৃথক বিহার নির্ধারণ করেছে। শুক্রবার 'খারীতা আম্মান' মন্দিরে জনগণকে পেট ভর্তি খাবার খাওয়ানো হয় অতঃপর বৌদ্ধমতে আমাদের শ্লোগান দেওয়া হয়। এভাবে কি মানুষ স্বাধীন মর্যাদা পাবে?

স্বাধীনতার পথ :

যে সমস্ত মানুষ স্বাধীনতার খোঁজে ছুটে বেড়াচ্ছে তাদের বলব, অস্পৃশ্যতা, দালিত্যের বেড়াজাল হতে মুক্তির একটাই পথ সেটা হচ্ছে 'ইসলাম'। সেজন্য আমি আপনাদের বলি, ইসলাম গ্রহণ করুন। হে দলিত বন্ধুগণ! আপনারা না পারাইয়া বৌদ্ধ না পাল্লা বৌদ্ধ হয়ে জন্মেছেন। আপনারা জন্মেছেন কেবলই মানুষরূপে। মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা একমাত্র ইসলামেই পাওয়া যাবে। কমিউনিষ্ট নেতা চোডিকাল চালাপ্পা তাঁর বই 'চল তোমরা ইসলামের দিকে'-তে লিখেছেন, আচ্ছুত গান্ধীর পূর্বেও ছিল, পরেও ছিল, এখনও আছে এবং আগামীতেও থাকবে। হে দ্রাবীড় জাতি, তোমরা চল ইসলামের দিকে। তোমাদের স্বাধীনতা একমাত্র ইসলামেই আছে।' সর্বভারতীয় ওয়ার্কশপ পার্মীর জেনারেল সেক্রেটারী ডাঃ চিয়াপ্পন M.B.B.S ইয়াগমুরা শ্রীলংকার বৌদ্ধবিহারে সবসময় পূজার জন্য যাতায়াত করতেন। সেখানে একবার তিনি আম্বেদকর জয়ন্তী করবার অনুমতি চেয়েছিলেন। তার উত্তরে তথাকার বৌদ্ধশাস্ত্রী নন্দীশাস্ত্রী বলেছিলেন, "আপনারা পারিযা বৌদ্ধদল শুধুমাত্র জাতপাত ভোলার জন্য 'বুদ্ধম মরনম' করেন।" তিনি জাত তুলে উত্তর দেওয়ার ফলে ক্ষুব্ধ ডাঃ চিয়াপ্পন বৌদ্ধবিহার হতে বেরিয়ে এসে আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন যে, আমার মত নেতার সাথে যখন এমন আচরণ তাহলে আমার জাতির সাধারণ মানুষের অবস্থা কি তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। এ ঘটনার পরে তিনি বই লিখলেন, 'পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য একমাত্র পথ ইসলাম।' ইসলামের স্বাধীনতা, সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ব আমার অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। এ ব্যাপারে আমার হজ্জ সফরের কিছু অনুভূতি উপস্থাপন করছি। হজ্জ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আমি আনন্দিত ও পুলকিত বোধ করছি। বিভিন্ন দেশ হতে আগত প্রায় ২০ লক্ষাধিক মানুষ কা'বাঘর তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করতে এসেছিলেন ও তারা সকলেই সমস্বরে আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে রেখেছিলেন। আমার জন্য এটা একটা নতুন অনুভূতি ছিল যে, একই সময়ে এত লোক একই স্থানে বিভেদহীনভাবে সমবেত হয়েছেন। ছিল না এদের মধ্যে জাতপাতের কোন অহমিকা, ভেদভারের কোন দুর্গন্ধ। কেননা জাতপাতের নিরস পরিবেশে আমার জীবনের বৃহৎ একটা অংশ অতিবাহিত হয়েছে। সাদা-কালো রঙের মানুষ বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত হয়ে সব একাকার হয়ে গেছেন। মনে হচ্ছে একটি সূতো দ্বারা সমগ্র মানুষকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কা'বাপ্রাঙ্গণে কাতারবন্দী হয়ে ছালাত পড়ার দৃশ্য আমাকে মন্ত্র-মুগ্ধ করেছে, যা মানব ইতিহাসের পুরনো যুগের নয় বরং আধুনিক বিশ্বের এক অসাধারণ সম্মেলন। ইসলামী শিক্ষার মৌলিক আদর্শগুলির অন্যতম হল পারস্পরিক ভালবাসা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যবাদ। যার পূর্ণ প্রতিফলন এই হজ্জের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। হজ্জে উপস্থিত হয়ে এসবের আনন্দ আমার মন-মস্তিষ্ক, শিরা-উপশিরা সবকিছুকে হিল্লোলিত করেছে।

মুসলমান ভাইদের প্রতি আমার পয়গাম :

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ! আপনারা যদি নবীর হাদীছ 'যারা উপস্থিত আছে তারা যেন অনুপস্থিতদের পৌঁছে দেয়'-এর প্রতি আমল করেন তাহলে সমগ্রবিশ্বে ইসলাম জয়ী হবেই ইনশাআল্লাহ। 'মানুষকে দেখবে যে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করছে *(সূরা নাছর)*।' শর্ত একটাই, আপনারা ইসলামের নমুনা বা মডেল হয়ে যান। নিজের কর্ম দ্বারা প্রমাণ করুন যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র পরিত্রাণের পথ। হে আল্লাহ, আমার প্রভু! তুমি মুসলিম উম্মাতকে এই গুরুদায়িত্ব পালনের ক্ষমতা দাও, এদেরকে পরকালে মুক্তি দান করো। আমি যেন জীবনের অন্তীম মুহূর্ত পর্যন্ত এই গুরু দায়িত্ব পালন করে আল্লাহ্‌র বিধান অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারি এবং এপথেই নিজেকে উৎসর্গ করে মৃত্যুবরণ কবতে পারি সেই দো'আ করছি। আমীন!

আমার ইসলাম গ্রহণের পরিণতি :

আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর মাদ্রাজসহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে আমাকে মেরে ফেলা ও কষ্ট দেওয়ার হুমকি দেওয়া হতে থাকে। একদা মাদ্রাজ বৌদ্ধিক সোসাইটিতে আমাকে ডেকে পাঠানো হয় এবং ইসলাম পরিত্যাগের জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়। আমি অস্বীকার করলে আমার এক শিষ্য স্বজোরে আমার ডান চোখে আঘাত করে যাতে সেটি বেরিয়ে পড়ে ও পরে পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এখন সৌন্দর্য রক্ষার্থে চোখটিতে পাথর বসানো আছে। অতঃপর ফুটন্ত পানি আমার উপরে ঢেলে দেওয়া হয়, যাতে শরীরের সম্পূর্ণ চামড়া খসে পড়ে। এ সংবাদ পুরো মাদ্রাজে (চেন্নাই) আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ে। তথাকার এক ধনী ব্যক্তি আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করে প্রায় ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে আমাকে সুস্থ করে তোলেন।

পারিবারিক জীবন :

ইসলাম পূর্ববর্তী জীবনে স্বামী আনন্দ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে বহু নারীসম্ভোগের ঘটনা আমার দ্বারা ঘটেছে *(নাঊযুবিল্লাহ)*। যারা আমার কাছে বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন হাজত পূরণ করার জন্য আসত। কিন্তু আমার ইসলাম পরবর্তী জীবন তা হতে পূর্ণভাবে পবিত্র। ইসলাম গ্রহণের পর সউদী সরকার আমাকে সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালে আমি তাতে সম্মত হই। যেহেতু ইসলামী নাম (মুহিবুল্লাহ) আমরা পাসপোর্টে ছিল না, সেজন্য আমি আমার পুরনো নামের পাসপোর্ট দ্বারা সউদীআরব যাই ও হজ্জ করি। পরে সেখানে সরকারী লোকজন স্থায়ীভাবে বাস করার অনুবোধ করেন। আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। আমি বলেছিলাম যে, আমি অতীত জীবনে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছি এবং আয়েশী জীবন কাটিয়েছি। সুতরাং তার প্রায়শ্চিত্যস্বরূপ অবশিষ্ট জীবন নবী মুহাম্মদ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবাদের ন্যায় অতিবাহিত করব। অতঃপর আমি দেশে ফিরে আসি। দেশে ফিরে বিবাহের কথা আলোচিত হলে অনেক ধনী মানুষ তাদের মেয়েকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলেও আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। শেষে এক কদাকার, কুৎসিত, বিধবা ও পিতৃহারা মেয়েকে বিবাহ করি। বিবাহের কথা আলোচনা করার সময় তাদের চা দেওয়ার সামর্থ্যটুকুও ছিলনা। আর আমিও এখন নিঃসম্বল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমার হবু স্ত্রীকে এক জোড়া চপ্পলও দিতে পারিনি। এমতাবস্থায় আমাদের বিবাহপর্ব সম্পন্ন হয়। আমাদের পরিবারে এক মেয়ের জন্ম হয় ও মারা যায়। অতঃপর আল্লাহ এক পুত্র দান করেছেন যাকে– শিক্ষার জন্য মাদ্রাজে ভর্তি করেছি। আল্লাহ যেন আমাকে, আমার স্ত্রীকে ও সন্তানকে ঈমানের উপর কায়েম রাখেন। আমীন!

সেব্রেনিসা গণহত্যা : ইতিহাসের কালো অধ্যায়

- ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

ইতিহাসের পাতায় স্বাধীন বসনিয়া

১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারী বসনিয়ায় গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। সে মোতাবেক বসনিয়া

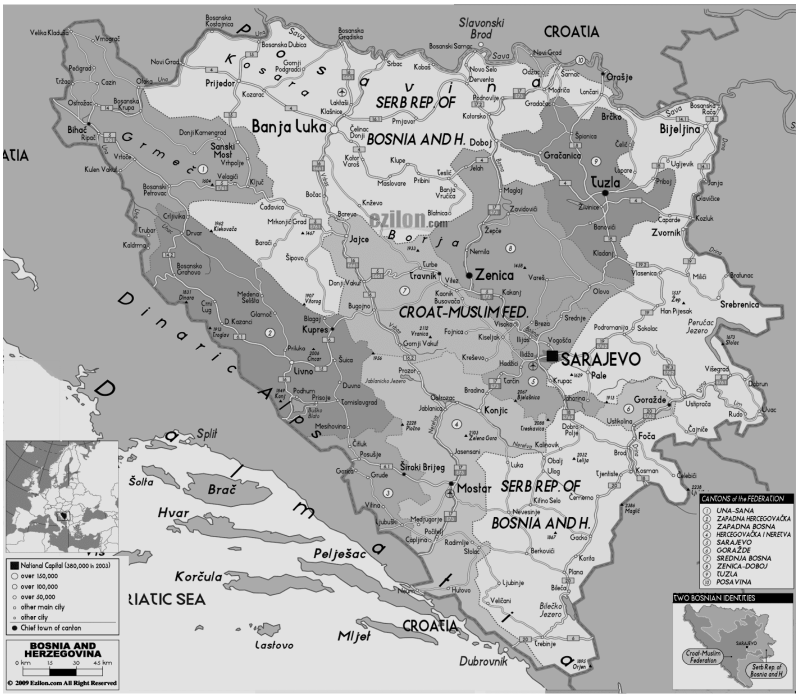

১৯৯২ সালের ১ মার্চ সাবেক যুগোস্লাভিয়া থেকে গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করে। নব্বই দশকের শুরুতে নিজস্ব স্টাইলে সমাজতান্ত্রিক দেশ যুগোস্লাভিয়া প্রজাতন্ত্র স্বাধীন ছয়টি দেশে বিভক্ত হয়। এগুলো হলো-সার্বিয়া, ভজভোদিনা, স্লোভেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়া-হারজেগোভিনা এবং মন্টেনিগ্রো। আর মেসিডোনিয়া ও কসভো ছিল স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে সার্বিয়া। সার্বরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল যুগোশ্লাভিয়ায়। তাদের হাতে ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা। রাজধানী বেলগ্রেড থেকে সার্বরা নিয়ন্ত্রণ করত গোটা যুগোশ্লাভিয়া। বর্তমানে সার্বিয়া ও মন্টেনিগ্রো একত্রে থাকলেও একে একে স্বাধীন হয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া, মেসেডনিয়া, হার্জেগোভিনা ও বসনিয়া। বসনিয়ার পশ্চিমে এবং উত্তরে ক্রোয়েশিয়া, পূর্বে সার্বিয়া এবং দক্ষিণে মন্টেনিগ্রো। বসনিয়ার মোট জনসংখ্যার ৪৯% মুসলমান, ৩১% সার্ব, ১৮.৫% ক্রোট এবং ১.৫% অন্যান্য। মুসলমানরা কমিউনিস্ট শাসিত শাসনামলে বিভিন্নভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক দিক দিয়ে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হওয়ার ফলে কমিউনিজমের পতনের সাথে সাথে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মুসলিম প্রধান বসনিয়ার স্বাধীনতার পর নতুন এ দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ত্রিপক্ষীয় দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা পরিচিত বসনিয় নামে। দেশটির অপর দুই সংখ্যালঘু জাতি সার্ব ও বসনিয় ক্রোট। ক্রোটরা পার্শ্ববর্তী দেশ ক্রোয়েশিয়ার সাথে এবং সার্বরা সার্বিয়ার সাথে বসনিয়াকে একীভূত করার দাবি তোলে। সার্বিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিম ও বসনিয় ক্রোটদের বিতাড়িত করার ঘোষণা দেয় সার্ব জাতীয়তাবাদী সমর্থকরা। সার্বরা বসনিয়ার স্বাধীনতা মেনে নেয়নি। তারা সার্বিয়ার মদদে বসনিয় মুসলমানদের চরম বিরোধিতা শুরু করে। এমনকি সার্বরা সেখানে একটা পার্লামেন্ট খাড়া করে পাল্টা সার্ব রিপাবলিকান ঘোষণা করে। এই রিপাবলিকানকে সার্বিয়ার সাথে অঙ্গীভূত করার লক্ষ্যে বসনিয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। গড়ে তোলে ৮০ হাজার সদস্যের এক শক্তিশালী সার্ব সেনাবাহিনী। আর এই বাহিনীর প্রধান ছিলেন জেনারেল রাতকো ম্লাদিচ। সার্বিয়া সরকার এই বাহিনীকে বিমান, কামান, ট্যাংক, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ দিয়ে প্রকাশ্যে সহায়তা করে। আর এসব সমরাস্ত্র দিয়ে সার্বরা বসনিয়ায় মুসলিম নিধনে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো হামলে পড়ে। সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের বুকে সবচেয়ে কলংকিত অধ্যায়। এ দলের নেতৃত্বে ছিলেন একজন সার্ব মনস্তাত্ত্বিক ডাক্তার রাদাভান কারাদজিচ। বসনিয়ার বিশাল অংশ জুড়ে সার্বদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করে তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দেন। জেনারেল রাতকো ম্লাদিচের নেতৃত্বে সার্বসেনারা একটির পর একটি শহর দখল ও বসনিয়া থেকে সার্ব ছাড়া মুসলিম ও ক্রোটদের বিতাড়িত করার কাজ শুরু করে।

যুদ্ধের কবলে বসনিয়া

বসনিয়ার যুদ্ধকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সবচেয়ে নৃশংস যুদ্ধ। কম্যুনিস্ট শাসিত সাবেক যুগোশ্লাভিয়া থেকে ভেঙ্গে স্বাধীন হওয়ার দু' বছরের মাথায় এই যুদ্ধ শুরু হয়। যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট স্লবোদান মিলোসেভিচ গোটা বলকান অঞ্চল জুড়ে সার্ব জাতির আধিপত্য কায়েমের স্বপ্ন দেখতেন। এ লক্ষ্যে বসনিয়ার রাজধানী সারাজেভো অবরোধ করে সার্ব বাহিনী মুসলমান হত্যায় মেতে উঠে। এই যুদ্ধে উগ্র সার্ব ও ক্রোয়েশিয়া বাহিনী নির্মমতার যে উদাহরণ তৈরি করেছিল বিশ্ব ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। বসনিয়ায় যুদ্ধচলাকালে একটি 'ত্রয়ীশক্তি' ইউরোপের বুকে খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। এরা হলেন তৎকালীন সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচ, বসনিয়ায় যুদ্ধরত স্ব-ঘোষিত সার্ব প্রেসিডেন্ট রাদাভান কারাদজিচ এবং তার সেনাপ্রধান জেনারেল রাতকো ম্লাদিচ। এই কুখ্যাত 'ট্রয়কা' ইউরোপের বুকে এক বিভীষিকাময় জাতিগত নির্মূল অভিযানে নেমেছিলেন, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে হিটলারের ইহুদী নিধনপর্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই তিনজনের লক্ষ্য ছিল বলকান এলাকাকে 'মুসলমান মুক্ত কর' এই এলাকা থেকে ওদের বিতাড়িত

কর, প্রয়োজনে নির্মূল কর। মুসলিম নারীদের ধর্ষণ কর, ওদের গর্ভে বেশি বেশি করে সার্ব সন্তানের জন্ম দাও'-উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে এমন সব উদ্ভট, হটকারী, বিকৃত সব দর্শনে বিশাসী ছিলেন এই 'ট্রয়কা'। এই বিশ্বাস নিয়েই জেনারেল ম্লাদিচ বলকান এলাকায় সবচেয়ে জঘন্যতম গণহত্যা-যুদ্ধাপরাধ এবং মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করেছেন।

১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধে একতরফাভাবে বসনিয়ার লাখ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় এবং বিশ লাখ নিরীহ মানুষ শরণার্থী হয়। সার্বসেনাবাহিনী ও পুলিশের হাতে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন হাজার হাজার বসনিয় নারী ও কিশোরী। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ক্রোয়েট বাহিনী বসনিয়ার আমিচি নামে একটি গ্রামে হামলা চালায়। বেছে বেছে ১১৬ জন মুসলিম পুরুষকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে। সার্বরা মুসলমানদেরকে নিধনের জন্য ব্যাপকহারে আক্রমণ চালাতে থাকে। তারা লাখ লাখ মুসলমানকে হত্যা করে এবং হাজার হাজার মুসলিম নারীদের ওপর মানবতাবিরোধী জঘন্য নির্যাতন চালায়। ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে সার্ব বাহিনী বসনিয়ার ৭৫% ভূমি দখল করে নেয়। ক্রোটদের দখলে চলে যায় ২০% ভূমি। রাজধানী সারাজেভোসহ মাত্র ৫% ভূমি মুসলমানদের দখলে থাকে। সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়া বাহিনীর নির্মমতা মুসলমানদের সইতে হয়েছে টানা সাড়ে তিনটি বছর। তবে এই যুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যাগুলোর মধ্যে 'সেব্রেনিসা গণহত্যা' বা 'জাতিগত শুদ্ধি' অভিযানই ছিল সবচেয়ে নৃশংস ও ভয়াবহ। এই গণহত্যাকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের সবচেয়ে নৃশংস ও ভয়াবহ গণহত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সেব্রেনিসা গণহত্যা

জাতিসংঘ বসনিয়া যুদ্ধ চলাকালে ১৯৯৩ সালে সেব্রেনিসা শহরটি 'নিরাপদ' শহর হিসেবে ঘোষণা করায় বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার আতংকিত মুসলমান জীবন রক্ষার জন্য সেখানে আশ্রয়

নিয়েছিল। সার্বদের হামলার আশঙ্কা আঁচ করতে পেরে সেখানকার মুসলমানরা ঐ শহর ও নিজেদের রক্ষার জন্য সশস্ত্র হতে চেয়েছিল কিন্তু জাতিসংঘের ডাচ শান্তিরক্ষীরা তাদের ঐ আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। আন্তর্জাতিক আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে রাতকো ম্লাদিচের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী সেব্রেনিসায় অভিযান চালায়। ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই সার্ব সেনারা বেলগ্রেডের তৎকালীন সরকারের সমর্থনে সেব্রেনিসা শহরটি দখল করে নেয়। রাতকো ম্লাদিচের নেতৃত্বে দু' হাজার সশস্ত্র সার্ব জাতিসংঘের পক্ষ থেকে নিরাপদ এলাকা হিসেবে ঘোষিত সেব্রেনিসা শহরটিকে ঘিরে ফেলে। সেব্রেনিসা শহরে উপস্থিত হয়ে জেনারেল রাতকো ম্লাদিচ দম্ভ করে বলেন, 'আজ ১১ জুলাই, ১৯৯৫। আমরা সার্বিয়ার সেব্রেনিসায় আছি। মহান ছুটির দিনের পূর্বক্ষণেই আমরা সার্বিয় জাতিকে এই শহর উপহার দিচ্ছি। তুর্কীদের বিরুদ্ধে উত্থানকে স্মরণ করছি। সময় এসে গেছে মুসলিমদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবার......'। আজ থেকে প্রায় ১৬ বছর পূর্বে ১১ জুলাই মুসলিমদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্বক্ষণে কথাগুলো বলেছিল বসনিয়ার গণহত্যার নায়ক জেনারেল রাতকো ম্লাদিচ। এ সময় শহরটির নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য মোতায়েন জাতিসংঘের ডাচ সেনারা নীরবে ঐ গণহত্যা প্রত্যক্ষ করে। সার্ব বাহিনী সেখানে জাতিসংঘের ডাচ শান্তিরক্ষীদের সামনেই ৮ হাজার ৩৭২ জন বসনীয় পুরুষ ও যুবক মুসলমানকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে মাটিচাপা দেয়। তারা সেখানকার প্রত্যেক কর্মক্ষম মুসলমান কিশোর ও যুবককে ট্রাকে করে তুলে নিয়ে পরে ব্রাশফায়ার করে নৃশংসভাবে হত্যা করে। কিছু লাশ গণকবর দেওয়া হয়। বাকিগুলো যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়। মানবতার বিরুদ্ধে এই জঘন্য অপরাধ সংঘটিত হয় বিশ্বাসঘাতক জাতিসংঘের নাকের ডগায়। মুসলমানদের প্রথমে শান্তির নামে ধোঁকাবাজি করে নিরস্ত্র করা হয় এবং তারপর তাদের উপর বর্বর সার্বিয় খ্রিস্টানদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। সার্ব বাহিনীর এই জঘন্যতম কর্মকাণ্ড আমাদেরকে ১৪৯২ সালের ১ এপ্রিল স্পেনের গ্রানাডায় ঘটে যাওয়া সেই লোমহর্ষক ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ফার্ডিন্যাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার নির্দেশে মুসলমানদের শেষ আশ্রয়স্থল গ্রানাডার পবিত্র মসজিদে আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার মুসলমান নারী, শিশুকে জীবন্ত দগ্ধীভূত করে হত্যা করা হয়। মুসলমানগণ যখন চরম দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত তখন প্রতারক ফার্ডিন্যান্ড ঘোষণা করে, 'মুসলমানরা যদি শহরের প্রধান ফটক খুলে দেয় এবং নিরস্ত্র অবস্থায় মসজিদে আশ্রয় নেয় তবে তাদের বিনা রক্তপাতে মুক্তি দেওয়া হবে'। দুর্ভিক্ষতাড়িত গ্রানাডাবাসী অসহায় নারী ও নিষ্পাপ বাচ্চাদের করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে খ্রিস্টানদের আশ্বাসে বিশ্বাস করে খুলে দেয় শহরের প্রধান ফটক। সবাইকে নিয়ে আশ্রয় নেয় আল্লাহ্‌র ঘর পবিত্র মসজিদে। শহরে প্রবেশ করে খ্রিস্টান বাহিনী মুসলমানদেরকে মসজিদের ভিতর আটকে রেখে প্রতিটি মসজিদে তালা লাগিয়ে দেয়। এরপর একযোগে ঐতিহাসিক গ্রানাডা শহরের সমস্ত মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বর্বর উল্লাসে মেতে ওঠে হায়েনারা। লক্ষ লক্ষ নারী, পুরুষ ও শিশু অসহায় আর্তনাদ করতে করতে জীবন্ত দগ্ধীভূত হয়ে প্রাণ হারায় পবিত্র মসজিদের মধ্যে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখায় গ্রানাডার আকাশ বাতাস যখন ভারী ও শোকাতুর, তখন ইসাবেলা ক্রুর হাসি হেসে বলতে থাকে, 'হায় এপ্রিলের বোকা! শত্রুর আশ্বাসে কেউ বিশ্বাস করে'? রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও তাঁর স্ত্রী ইসাবেলার চক্রান্তে ইউরোপের একমাত্র সমৃদ্ধ মুসলিম রাষ্ট্র স্পেনের রাজধানী গ্রানাডায় ৭ লক্ষ মুসলিম নর-নারীকে সীমাহীন প্রতারণার মাধ্যমে মসজিদে ভরে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। আটশ' বছরের গৌরবোজ্জ্বল ইসলামী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মুসলমানদের ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর এ বিয়োগান্ত ঘটনাকে স্মরণ করে খ্রিস্টান জগৎ প্রতি বছর ১লা এপ্রিল আড়ম্বরের সাথে পালন করে আসছে 'April fool' মানে 'এপ্রিলের বোকা' উৎসব হিসাবে। ঠিক একইভাবে ১৯৯৫ সালের ১১ জুলাই

বলকান অঞ্চলকে মুসলিম শূন্য করার দীর্ঘমেয়াদী অপতৎপরতার অংশ হিসেবে 'নিরাপদ' শহরে আশ্রয় গ্রহণকারী নিরীহ মুসলমানদের উপর চালানো হয় সেব্রেনিসা গণহত্যা।

বসনিয়ায় কত নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর নিহত হয়েছে, কত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে তা পরিমাপ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে বিভিন্ন সূত্রে যেসব তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা সভ্যতার কলংক ছাড়া আর কিছু নয়। লাখ লাখ নারী-শিশু নিহত হওয়া ছাড়াও কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে চারশ বছরের পুরনো দু'টি মসজিদসহ আটশ' মসজিদ। ইজ্জত-সম্ভ্রম হারিয়েছে প্রায় ৬০ হাজার নারী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিচালিত নাজী বাহিনীর বীভৎস নারী নির্যাতনের পর এ ধরনের ঘটনা বিরল। মানবতার খাতিরেই সার্ব বাহিনীর এই দানবীয় তাণ্ডব বন্ধ করা মনুষ্যত্বের দাবি ছিল। কিন্তু রহস্যজনক কারণে বিশ্ব মোড়লদের কার্যত নির্বিকারে সার্ব বাহিনী মরিয়া হয়ে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটে যায় সেব্রেনিসা গণহত্যা। রচিত হয় ইতিহাসের ন্যক্কারজনক কালো অধ্যায়।

স্বজন হারানো বসনিয়ার মুসলমানরা প্রতিবছর ১১ জুলাই স্মরণ করে থাকে। সেব্রেনিসার মাঠগুলোতে এখনও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে শত শত গণকবর। স্বজন হারানো মানুষের আহাজারিতে এখনও সেব্রেনিসার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে আছে। তারা বলেন, আমরা কিভাবে ভুলব সেখানকার গাছে গাছে ঝুলন্ত মুসলমানদের মৃতদেহগুলোর কথা, আমাদের স্মৃতিতে দুঃস্বপ্ন হয়ে আছে হাজার হাজার মুসলমান মহিলার অপমানের কাহিনী, আমরা এখনও ভুলিনি সেই অসহায় ভাইদের যাদের পশুর মত জবাই করা হয়েছিল...... ষোল বছর আগে সেব্রেনিসায় সার্ব বাহিনী যে ৮১০০ মুসলমানকে হত্যা করেছিল, বসনিয়ায় সেই গণহত্যার বার্ষিকীতে প্রত্যক্ষদর্শীরা এ কথাগুলো বলেন। যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের অনেককেই দাফন করা হয় সেব্রেনিসার 'পটচারি' গোরস্থানে। আবার অনেকের লাশ যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ডের শিকারদের দাফন করা এখনও শেষ হয়নি, কারণ এখনও গণকবর পাওয়া যাচ্ছে। ২০১০ সালে শনাক্ত করা আরও ৭৭৫টি মৃতদেহ সম্প্রতি পটচারের গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ভূমিকা

আক্রমণকারী সার্বিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থতা জাতিসংঘের কার্যকারিতার প্রতি সন্দিহান করে তোলে দুনিয়ার শান্তিকামী মানুষকে। বসনিয়া ৭০ ভাগ এলাকা জবরদখল করে যারা জাতিসংঘের প্রতি বৃদ্ধাংগুলি প্রদর্শন করে জাতিসংঘ তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বসনিয়ার সংখ্যাগুরু অধিবাসীদের জন্য ছয়টি শহরকে নিরাপদ অঞ্চল ঘোষণা করে। শহরগুলো হলো-সারাজেভো, তুজলা, জেপা, গোরাজদে, বিহাক এবং সেব্রেনিসা। কিন্তু জাতিসংঘ ঘোষিত এই নিরাপদ শহরগুলোতেও সার্ব এবং ক্রোট বাহিনী ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানোর মাধ্যমে মুসলমান হত্যায় মেতে উঠে।

মানবাধিকারের কথিত ধ্বজাধারী ইউরোপীয় সরকারসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর নীরবতা ও প্রকৃত অর্থে তাদের সহযোগিতার ফলে সার্বরা জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ঘোষিত 'নিরাপদ' ঐ শহরটি দখল করে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের মোতায়েন করা হয়েছিল ঐ শহরে। সেখানে মোতায়েন জাতিসংঘের সেনারা ছিল হল্যাণ্ডের নাগরিক। নীল টুপি পরা হল্যাণ্ডের শান্তিরক্ষীরা সার্বদের হামলা ঠেকানোর জন্য হল্যাণ্ড সরকারের বা ন্যাটোর সহায়তা চাইতে পারত। কিন্তু তারা তা না করে সেব্রেনিসা শহরটির নিরস্ত্র মুসলমানদেরকে বর্ণবাদী সার্বদের হাতে ছেড়ে দেয়। হল্যাণ্ডের শান্তিরক্ষীরা ঐ সময় মুসলমানদের জীবন রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। এমনকি শান্তিরক্ষী বাহিনীর প্রধান সার্বদের হাতে ঐ শহর দখলকে 'যৌক্তিক পদক্ষেপ' বলে মন্তব্য করেছিলেন। ঐ কর্নেল ও তার অধীনস্থ সেনারা স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর সেখানে ব্যাপক অভ্যর্থনা পান এবং তাদের পুরস্কারও দেওয়া হয়।

সেব্রেনিসা গণহত্যায় নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজন ঐ গণহত্যা প্রতিরোধে নিষ্ক্রিয়তা ও গণহত্যায় সহায়তার জন্য দায়ী ডাচ শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার উদ্যোগ নিলেও হেগের আন্তর্জাতিক আদালত তা গ্রহণ করেনি। বসনিয়ার গণহত্যা শেষে সেখানকার জাতিগত শুদ্ধি অভিযান সম্পর্কে গঠিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সেব্রেনিসায় গণহত্যা ঠেকানোর ব্যাপারে হল্যাণ্ড সরকার ও জাতিসংঘের অবহেলার কথা স্বীকার করা হয়েছে।

সেব্রেনিসা গণহত্যার জন্য কেবল তৎকালীন হল্যাণ্ড সরকার ও জাতিসংঘ দায়ী ছিল না, মানবাধিকারের রক্ষক হওয়ার দাবিদার পাশ্চাত্যের প্রতিটি সরকার ও সংস্থা দায়ী। কারণ জেনে শুনেও গণহত্যার হুমকির সম্মুখীন নিরস্ত্র মুসলমানদের রক্ষার জন্য তারা বিন্দুমাত্র চেষ্টা চালায়নি, বরং উগ্র সার্বদেরকে গণহত্যা চালানোর সুযোগ করে দিয়েছিল। এই জন্যই হয়তো ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ বসনিয়ার উপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই আরোপের পেছনে কাজ করে রাশিয়া ও বৃটেনের সার্বদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক ভূমিকা। জাতিসংঘ কর্তৃক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে বসনিয়ার মুসলিম সরকার বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে পারেনি। অপরদিকে যুদ্ধরত সার্ব বাহিনী পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাষ্ট্র সার্বিয়া থেকে অবাধে ধ্বংসাত্মক অস্ত্র পায় এবং সেই অস্ত্র দিয়েই মুসলিম সৈন্যদেরকে প্রতিহত করে। অন্যদিকে ক্রোটরা অস্ত্র পায় পার্শ্ববর্তী ক্রোয়েশিয়া থেকে। সার্ব বাহিনী যখন ভারী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জি হয়ে গণহত্যা, নারী ধর্ষণ ও সম্পদ বিনষ্ট পরিস্থিতি ভয়াবহরূপ ধারণ করে, ঠিক তখনই নিরাপত্তা পরিষদ বসনিয়ায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হয। কিন্তু বাস্তবে সেখানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া কিছুই করার ছিল না।

তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বসনিয়ায় সার্বদের আগ্রাসন ও গণহত্যা ঠেকানোর জন্য কোন উদ্যোগ নেননি। বসনিয় মুসলমানদের রক্ষা করা 'মার্কিন স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট' নয় বলে তিনি মন্তব্য করেছিলেন। মার্কিন ইউ-টু গোয়েন্দা বিমানগুলো গণহত্যার ঘটনা দেখতে পেয়েও নীরব থেকেছে। হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের সাবেক প্রধান ক্লারা ডেল পন্টির মুখপাত্র ফ্লোরেন্স হার্টম্যান 'শান্তি ও শাস্তি' শীর্ষক বইয়ে বসনিয়ার ট্রাজেডির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'মার্কিনীরা বলকানে রহস্যজনক ও জটিল খেলা খেলে হেগের আদালতে মুসলমানদের হত্যাকারী সম্পর্কে ভুল তথ্য দিত এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ, র সাথে এ আদালতের দীর্ঘদিনের সহযোগিতার সম্পর্ক নিস্ফল হয়েছে।' ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও সহযোগিতা সংস্থার সাবেক উপ-প্রধান উইলিয়াম এশ্টুবনার বলেছেন, 'সেব্রেনিসার গণহত্যার নায়ক সার্ব জঙ্গী বা আধা সামরিক বাহিনীর

প্রধান রাতকে স্লাদিচের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা সত্ত্বেও বলকানের এই কসাই বসনিয়ায় মার্কিন নিয়ন্ত্রিত এলাকায় মুক্ত মানুষের মত বসবাস করত।' তথাকথিত সভ্য ইউরোপের বুকে মানবতার বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ পাশ্চাত্যকে কলংকিত করেছে।

ডেটন চুক্তি ও যুদ্ধের সমাপ্তি

সেব্রেনিসা গণহত্যার পর টনক নড়ে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের। তড়িঘড়ি দখলদার বাহিনীর উপর বিমান হামলা শুরু করে ন্যাটো। এরপরই পিছু হটতে শুরু করে দখলদার সার্বিয়রা। ১৯৯৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্যারিসে 'ডেটন চুক্তি'তে সই করে সেনা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয় সার্বরা। দেশ ছেড়ে পালান বসনিয়ার কুখ্যাত সার্ব নেতা স্লাদোভান কারাদিচ। তখনই সার্ব কর্মকর্তাদের বিচারের জন্য যুগোশ্লাভিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত গঠন করে জাতিসংঘ। গণহত্যার নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে ৪৬ সার্বনেতাকে অভিযুক্ত করেন এ আদালত। অভিযুক্ত নেতাদের মধ্যে এ যাবৎ সার্বিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্লাদোভান মিলোসেভিস, স্ব-ঘোষিত বসনিয়ার সার্ব প্রেসিডেন্ট রাদাভান কারাদজিচ এবং সর্বশেষ গ্রেফতার হন সার্ব সেনাপ্রধান জেনারেল রাতকো স্লাদিচ।

আদালতে বলকানের কসাই

বসনিয়ার যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য একটি আন্তর্জাতিক আদালত গঠিত হয়। এ লক্ষ্যে ১১ জন বিচারক শপথ করে আনুষ্ঠানিকভাবে। একজন প্রসিকিউটর ও আন্তর্জাতিক বিচারকদের একটি প্যানেলের সমন্বয়ে গঠিত এই আদালত নেদারল্যাণ্ডের দ্যা হেগ শহরে অবস্থান করে কাজ চালাবে। কিন্তু 'বলকানের কসাই' খ্যাত স্লোবোদান মিলোসেভিস সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াতেন আরেক কসাই রাতকো স্লাদিচ। ২০০১ সালে মিলোসেভিসকে গ্রেফতার করে হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে হস্তান্তর করা হয়। ২০০৬ সালে কারাগারেই তার মৃত্যু হয়। ১৯৯৬ সালে আত্মগোপনে চলে যান সেব্রেনিসা গণহত্যার মোস্ট ওয়ান্টেড যুদ্ধাপরাধী রাতকো স্লাদিচ । বসনিয়ার কসাই হিসেবে খ্যাত এই সাবেক সেনাপ্রধান দীর্ঘ ১৬ বছর আত্মগোপনে থাকার পর সম্প্রতি সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সার্বিয়াতেই পালিয়ে ছিলেন বলকানের তিন কসাই খ্যাতদের অন্যতম ভয়ংকর যুদ্ধাপরাধী ৬৯ বছর বয়সী এই সার্ব জেনারেল রাতকো স্লাদিচ। রুমানিয়ার সীমান্ত ঘেঁষা লাজারেভো গ্রাম থেকে ২৬ মে ২০১১ ভোরে স্লাদিচকে গ্রেফতার করে সার্ব নিরাপত্তা বাহিনী। গ্রামটি বেলগ্রেড থেকে ৫০ মাইল উত্তরে। সেখানে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকতেন তিনি। যদিও সার্বিয়া আন্তর্জাতিক চাপ এড়াতে এতদিন স্লাদিচের গ্রেফতারের জন্য লোক দেখানো ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল। কিন্তু দেখা গেল জেনারেল স্লাদিচ তাদেরই আশ্রয়ে এতদিন নিরাপদ জীবনযাপন করে এসেছেন। ২০০৮ সালে স্ব-ঘোষিত বসনিয় সার্ব প্রেসিডেন্ট যুদ্ধাপরাধী রাদোভান কারাদজিচ গ্রেফতার হওয়ার পর স্লাদিচ বসনিয় যুদ্ধাপরাধের ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রেফতারের পর সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস তাদিচ ঘটা করে সংবাদ মাধ্যমে জানালেন, 'স্লাদিচকে গ্রেফতারের মধ্য দিয়ে সার্বিয়ার দায়মুক্ত হল। সমাপ্তি ঘটল দুঃখজনক ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের'। ন্যাটোর প্রধান আন্ডারস রাসমুসেন গ্রেফতারের ঘটনায় প্রশংসা করে বলেছেন, 'অবশেষে ন্যায় বিচারের সুযোগ এসেছে'। অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনাল মন্তব্য করেছে, '১৫ বছরের বেশি সময় লেগে গেলেও যারা ভুক্তভোগী তাদের জন্য ন্যায় বিচারের আশা তৈরি হল। জেনারেল স্লাদিচ ছাড়া বাকি আসামীরা হলেন সার্বিয়ার সাবেক জেনারেল ভূজাদিন পোপোভিচ, ড্রাগো নিকোলিচ, লজুবিসা বেয়ারা, ভিনকো পান্ডুরেভিচ, রাদিভোজে মিলেটিচ, মিলান ভেরো এবং পুলিশ কর্মকর্তা লজুবমির বোরোভকানিন।

আদালতে স্লাদিচের রিরুদ্ধে ওঠা ১৫টি অভিযোগের সবই হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে সবচেয়ে মারাত্মক যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত গণহত্যা দু'টি হল যুদ্ধ শুরুর দিকে প্রিজেদোর এলাকায় একটি নিরাপদ ক্যাম্পে দেড় হাজার মুসলমানকে হত্যা করা এবং ভয়াবহ সেব্রেনিসা গণহত্যা। এই গণহত্যার প্রধান আসামী রাতকো স্লাদিচ আদালতে উচ্ছৃংখল ও হঠকারী আচরণ করেছেন। বিশেষ আদালতের ১৫ বছরের ইতিহাসে আর কখনও এমন নাটকীয় ঘটনা দৃশ্যমান হয়নি। বলকানের কসাই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন। বিচারক যখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনাচ্ছিলেন তখন স্লাদিচ চিৎকার করে বলেন, 'না, না আমি আমার উকিল ছাড়া এসব শুনব না'। এরপর স্লাদিচ কান থেকে হেডফোন সরিয়ে নেন এবং এভাবে এটি বুঝিয়ে দেন যে, বিচার কার্যক্রমের ধারা বিবরণী অনুবাদ শোনার কোন ইচ্ছে তার নেই। যে ব্যক্তি একটি জাতিকে দ্বিখণ্ডিত করেছে, গণহত্যা, জোর খাটিয়ে বহিষ্কার, ত্রাস সৃষ্টি, অপহরণ ও অমানবিক তৎপরতার মত নানা অপরাধের হোতা, এই কসাই কিভাবে আন্তর্জাতিক আদালতে দাঁড়িয়ে এমন হঠকারী আচরণ করল তা আমাদের বোধগম্য নয়। তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। এ প্রত্যাশাই বিশ্বের শান্তিকামী জনতার।

উপসংহার

সেব্রেনিসা গণহত্যা বসনিয়া গণহত্যাগুলোর একটি অংশ মাত্র। সাবেক যুগোশ্লোভিয়া ভেঙ্গে অনেক দেশই স্বাধীন হয়েছিল। কিন্তু ক্রোয়েশিয়া, স্লোভেনিয়া ও ম্যাসিডোনিয়ার বিপরীতে কেবল বসনিয়াতেই মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই বসনিয়া পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতির শিকার হয়। পাশ্চাত্য ইউরোপের বুকে একটি মুসলিম দেশের আবির্ভাব সহ্য করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাইতো, সেব্রেনিসা 'নিরাপদ' শহরটিকে যখন রাতকো স্লাদিচের নেতৃত্বে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হয় তখন সেখানকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জাতিসংঘের ডাচ সেনারা নীরবে গণহত্যা প্রত্যক্ষ করে। আসলে সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার যুদ্ধাপরাধ তদন্ত আদালত সত্যিই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও বসনিয়ার গণহত্যার মূল হোতাদের শাস্তি দিতে চায় কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। যদি এই আদালত ন্যায়বিচার চায় তাহলে ইউরোপের যেসব সেনা কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের অবহেলা বা নিষ্ক্রিয়তার জন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐ ভয়াবহ গণহত্যার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাদেরকেও শাস্তি দিতে হবে। কারণ তারাও ছিল ঐ মহা অপরাধের সহযোগী বা শরীক। ইউরোপ ও মার্কিন সরকারের মধ্যস্থতায় ডেটনচুক্তির মাধ্যমে ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার যুদ্ধ শেষ হলেও এখনও সেখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম বৈষম্য ও নতুন নতুন ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বারিধারা ক্যাম্পাস, ঢাকা

ধর্ম নিয়ে বিতর্ক

এমদাদ বিন মোযাম্মেল

অর্থই অনর্থের মূল। কথাটি চরম সত্য। কারণ দুনিয়ার জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মাঝে যত শত্রুতা, হানাহনি, রক্তপাত হয়েছে তা প্রধানতঃ দু'টি কারণেই হয়েছে। একটি নারী, অপরটি অর্থ। যেমন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম রক্তপাত ঘটিয়েছিল কাবিল, তার কারণ ছিল নারী। মূলত এগুলো অস্থায়ী উপভোগের বিষয়। এই অস্থায়ী উপভোগের বিষয়গুলো নগদ পাই বলে স্থায়ী উপভোগের বিষয়গুলো দূরে ঠেলে দিয়ে জেনে অথবা না জেনে আমরা অনেক সময় তর্ক-বিতর্ক করে থাকি। এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু সেই বিতর্ক হয় যদি ধর্মীয় বিষয় নিয়ে- যা পরকালীন স্থায়ী উপভোগ্য জগতের সাথে জড়িত, তাহলে তা সত্যিই ভাবার বিষয়। আবার অন্যদিকে ধর্মীয় বিষয় নিয়েও তর্ক হওয়া স্বাভাবিক। কারণ দুনিয়াতে অনেক ধর্ম চালু আছে এবং প্রতিটি ধর্ম অনুসরণকারী দাবী করে থাকে আমাদের ধর্মই সত্য। যেমন মরিস বুকাইলি, পণ্ডিত রজনীশ, উইলিয়াম ক্যাম্পবেল, শ্রী শ্রী রবি শংকর এমন অনেক ব্যক্তিই রয়েছেন যারা নিজ নিজ ধর্ম নিয়ে গর্ব ও সত্যতার দাবী করেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং অন্যদিকের বিতর্ক নিয়ে না ভেবে আসুন ইসলামকে নিয়ে যে বিতর্কের ঝড়-ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করি। দুঃখজনক হলেও সত্য আমরা মুসলমানরা এই ইসলামটাকে (শরীয়ত) টেনেহিঁচড়ে চর্ম-পেশী বিহীন খাড়া কংকালের মতই দাঁড় করিয়েছি। আজ বিধর্মীদের মাঝেও বিষয়টি সুস্পষ্ট, এজন্য তারা আমাদেরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করার সুযোগ পায়। যেমন ডা. জাকির নায়েকের 'বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব' নিয়ে একটি আলোচনার পর প্রশ্নোত্তর পর্বে জনৈক হিন্দু ব্যক্তি বলেন, আপনি বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ডাক দিচ্ছেন অথচ আপনাদের মুসলমানদের মাঝে নেই ভ্রাতৃত্ব, নেই ঐক্য, আপনারা আজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত। কথাটি যেমন সত্য তেমনি মুসলমানদের জন্য বড় লজ্জাজনক, অপমানজনক। সত্যিই আজ আমরা মুসলমানরা শত শত দলে বিভক্ত এবং প্রত্যেক দলই দাবী করে আসছি আমরাই সঠিক পথের দিশারী। যদিও আমাদের ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ একই ইসলাম, কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। শরীয়তের বিষয় নিয়ে এই দলাদলি দেখে মনে হয় আমাদের ইসলামটা যেন অপূর্ণাঙ্গ ছিল আর প্রত্যেক দলের নেতারাই নিজ নিজ মত দিয়ে ইসলামটাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন *(নাঊযুবিল্লাহ)*। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম' *(মায়েদা ৩)*। এই আয়াতটি তো বিদায় হজের ভাষণেই নাযিল হয়েছিল, তাহলে নতুন করে আমরা কি কি বিষয় যোগ-বিয়োগ করেছি, যার কারণে আমরা আজ দলে দলে বিভক্ত? এই কারণগুলো আমাদের অনুসন্ধান করে প্রত্যেক মুসলমানের নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসা উচিত। আল্লাহ আরও বলেন, 'অবশ্যই আমি এই কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উত্থাপন করেছি, যেন তারা চিন্তা করে' *(যুমার ২৭)*। আসমান যমীনে এমন কোন অদৃশ্য বস্তু নেই যা স্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই *(নমল ৭৫)*। তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে রাসূলের মধ্যে *(আহযাব ২১)*। এই আয়াতগুলিতে সুস্পষ্ট যে, আমাদের শরীয়ত মানার জন্য, জান্নাত পাওয়ার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছই যথেষ্ট। সত্যিকার অর্থে আমরা সবাই যদি সকল মতভেদকে উপেক্ষা করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেই, তাহলেই আমাদের সার্বিক সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে। সম্ভব হবে মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্য বাস্তবায়ন।

এই সহজ রাস্তা সামনে থাকার পরও কি কি কারণে আমরা মুসলমানরা শান্তির ধর্ম ইসলাম কে নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করি? এর জন্য মূলত দায়ী কারা? এক শ্রেণীর নামধারী, পেটপূজারী আলেমরাই যে আমাদের সাথে প্রতারণা করছে এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ প্রতারণার সুযোগটি আমরাই তৈরি করে দিয়েছি। সোনালী যুগের ইতিহাসের দিকে আমরা ফিরে তাকালে দেখতে পাই যে, সে সময় প্রতিটি মুসলিম পরিবারে ছিল যোগ্য আলেম, প্রতিটি বাড়ী ছিল শরীয়তের জ্ঞানচর্চার এক পাঠাগার। আর এজন্য তাদের আমল ও আক্বীদা ছিল এক, অভিন্ন। আর বর্তমান সময়ে প্রতিটি পরিবারে যোগ্য আলেম পাওয়া দূরে থাকুক, পুরো একটি সমাজে যোগ্য আলেম খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার। আর প্রতিটি বাড়ীতে জ্ঞানচর্চার পাঠাগার তো দূরে থাকুক সমাজের কেন্দ্রবিন্দু মসজিদেও জ্ঞানচর্চার কোন পাঠাগার নেই। আর এই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানচর্চা ছেড়ে দেওয়ার কারণে আজ চলমান সুষ্ঠু সুন্দর সমাজে এক আলেম এসে বলে, ভাইসব! এটা করা জায়েয। কিছু সংখ্যক লোক তার অনুসরণ করে। আবার কিছুদিন পর আরেক আলেম বলে, ভাইসব! সেটা করা না জায়েয। কিছু সংখ্যাক লোক তার পিছে চলে যায়। আবার কিছুদিন পর আরেক আলেম বলে, ভাইসব! দুটোই করা জায়েয। তৈরি হয়ে যায় আরেক দল। আবার কিছুদিন পর আরেক আলেম বলে, ভাইসব! দুটোই না জায়েয। তৈরি হয়ে যায় আরেক দল। এইভাবে আমাদের অজ্ঞতার কারণে একশ্রেণীর স্বার্থবাদী আলেমরা প্রতারণা করে আসছে। আমাদের উচিত ছিল, যখনই একটি বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিবে তখনই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া *(নিসা ৫৯)*। উপরোক্ত উদাহরণটির মত অবস্থা হলে আমরা যদি তাদের ফতোয়ার প্রমাণ চাইতাম, তাহলে ধরা পড়ত কে সঠিক কথা বলেছে। দুঃখের বিষয় আমরা নিজেরা কুরআন-সুন্নাহর চর্চা তো ছেড়েই দিয়েছি তদুপরি প্রমাণ চাওয়ারও প্রয়োজনীয়তাটুকুও বোধ করি না। ব্যাপারটি সহজভাবে বোঝার জন্য আমি বাস্তব একটি ঘটনা পেশ করছি। ১৯৮১ অথবা ৮২ সালের ঘটনা। আমাদের গাইবান্ধা যেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন কাটাবাড়ী ইউনিয়নে উপজাতি সাঁওতাল আছে। সেসময় তাদের ঘরে তো শিক্ষা ছিলই না; বরং পুরো জাতিই ছিল অশিক্ষিত। বেশ কিছু লোক সেখানে এসে স্থায়ী বসবাসের জন্য তাদের নিকট থেকে জমি কিনতে চাইলো। জমি কিনতে গিয়ে দেখল তারা একেবারে অজ্ঞ জাতি। শুরু করলো প্রতারণা। সাঁওতালদের বলল, আমি এক বিঘা জমি কিনব, তুমি রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে বলবে আমি এক একর জমি বিক্রয় করেছি। সাওতাল বলল, মণ্ডল সাহেব এক একর কি? শিক্ষিত লোকেরা বলল, একর হচ্ছে ইংরেজী শব্দ, বিঘা হচ্ছে বাংলা। অফিসে সবাই শিক্ষিত। তুমি ইংরেজিতে একর বললে সবাই খুশি হবে। তাদের কথামত অজ্ঞ সাঁওতালরা বলল, আমি এক একর জমি বিক্রি করেছি। ব্যাস দলীল হল তিন বিঘার। কিছুদিন পর জমির মালিকানা সূত্রে তিন বিঘা জমি দখল করতে গেলে সাঁওতালরা বলল, মণ্ডল সাব আপনি জমি কিনেছেন এক বিঘা, তিন বিঘা দখল করছেন কেন? অবশেষে বিচার-শালিস বসল। বিচারে হাজারো লোকের উপস্থিতিতে জানতে পারল, একর হচ্ছে তিন বিঘা। সাঁওতাল বুঝতে পারল, তাদের অজ্ঞতার কারণে তারা প্রতারণার শিকার। তারা শিক্ষার দিকে ছুটল। আজ তাদের প্রত্যেকের ঘরে কমবেশী শিক্ষিত ছেলে-মেয়ে রয়েছে। এখন আর তাদের কেউ ঠকাতে পারে না।

এই ঘটনার সাথে আমাদের দেশের একশ্রেণীর আলেমের দারুণ মিল রয়েছে। আমরা কুরআন ও হাদীছের চর্চা ছেড়ে দেওয়ার কারণে হয়েছি অজ্ঞ। আর এই অজ্ঞতার কারণে সেই সব আলেমগণ মন যা চায় তাই শরীয়ত বলে আমাদের উপর জগদ্দল পাথরের মতো চাপিয়ে দেয়। তাহলে কি আমাদের সে সময় এখনও হয়নি সাঁওতালদের মত সঠিক জ্ঞান অর্জন করে এইসব মুখোশধারী আলেমদের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার? আমাদের কি সময় আসেনি একটি বিষয় নিয়ে বিভিন্ন রকম ফতোয়া প্রদানকারীদের নিকট দলীল-প্রমাণ চাওয়ার? মনে রাখবেন এটার ভিত্তি যেন হয় অবশ্যই কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা, এই বাস্তব ঘটনাটি নিছক সাময়িক। অর্থাৎ দুই দিনের দুনিয়ায় স্বার্থ রক্ষার জন্য শুধু সাঁওতাল নয় আমরা মুসলমানরাও বিভিন্ন কলাকৌশল রপ্ত করতে ব্যস্ত। তাহলে কেন স্থায়ী শান্তির জন্য আমার আমল-আক্বীদা যাচাই-বাছাই করে সংশোধন করব না? যার সাথে আমার পরকালের জান্নাত জাহান্নামের সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এই ভেজালমার্কা চলমান আমল-আক্বীদা যাচাই-বাছাই করে সংশোধন করতে চাইলেই লেগে যায় তর্ক। সেটা হয় কখনো জেনে, কখনো হয় না জেনে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এমন কিছু লোক আছে যারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করে' *(হজ্জ ৩)*। আল্লাহ পাক আবার বলেন, 'এমন কিছু লোক আছে যারা অজ্ঞতা সত্ত্বেও হেদায়াত ও উজ্জ্বল গ্রন্থ ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক আরম্ভ করে দেয়' *(হজ্জ ৮)*। এই দুটি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যদি আমাদের স্রষ্টা এবং তার বিধানের (শরীয়তের) ব্যাপারে কোন বিষয় জানা না থাকে তা নিয়ে তর্ক না করা। নিরপেক্ষভাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে সত্যটা জানা এবং মানা। আমার বাপ-দাদারা যা বলেছে, আমার আলেম যা বলেছে, তাতে ভুল থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমি প্রমাণ না জেনে সেইসব শোনা কথা নিয়ে কেন তর্ক-বিতর্ক করে বেড়াব? আল্লাহ পাক বলেন, যারা শোনা কথা (যাচাই-বাছাই না করে) বলে বেড়ায় তারা অধিকাংশই মিথ্যাবাদী' *(শু'আরা ২২৩)*। আবার আমরা অনেকে আছি, জানি না তেমন কিছু, তারপরও অনুমান করে তর্ক-বিতর্ক করি। আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে বলেন, 'হে বিশ্বাসীরা! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপ' *(হুজুরাত ১১)*। শরীয়ত এমন একটি বিষয়, যাতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘরে বসেই পাপ অথবা পুণ্য অর্জন করা যায় স্থায়ীভাবেই। যেমন হাদীছে এসেছে–যদি কোন ব্যক্তি অপরদের ভাল পরামর্শ, ভাল নির্দেশ, ভালোর দিকে আহ্বান করে, তার যত অনুসারী সে আমল করবে, আহ্বানকারী ব্যক্তিও সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে। অপরপক্ষে যদি কোন ব্যক্তি অপরকে কুপরামর্শ, কুনির্দেশ, কুপথে আহ্বান জানায়, তার যত অনুসারী সে আমল করবে, আহবানকারী ব্যক্তিও সমপরিমাণ পাপ অর্জন করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮,২১০)*।

প্রিয় ভাইয়েরা! আসুন, অন্তত ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্কের বেলায় কখনো নিজে জ্ঞান অর্জন না করে শোনা কথায় অথবা আলেমের দোহাই অথবা বাপদাদার দোহাই অথবা অনুমান করে কথা বলা থেকে বিরত থাকি। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিধান আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন। বস্তুত মানবজাতি অধিক বিতর্কপ্রিয় *(কাহফ ৫৪)*। আসুন! আমরা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই জানার চেষ্টা করি আমাদের সমস্যার সমাধানগুলো কোথায়। না জেনে অথবা শোনা কথায় তর্ক করলে লাভের চাইতে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। আল্লাহ পাকের সাবধান বাণী, (হে মানব জাতি) যে সম্পর্কে তোমাদের জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগে (তর্কে) যেও না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও অন্তর–এদের প্রত্যেকটিই তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*। যারা দলীল-প্রমাণ ছাড়াই না জেনে তর্ক করে তাদের সাথে একটি ঘটনার দারুণ মিল রয়েছে। যেমন– এক রাজার নাপিত ছিল। নাপিত তার এই পেশার পাশাপাশি বাড়ীতে অবসর সময়ে তৈল মাড়াত। তার তৈল মাড়ানোর জন্য ঘানি টানার একটি গরু ছিল। সে গরুটিকে আদর করে মানকু বলে ডাকত। হঠাৎ গরুটি মারা যায়। নাপিত সেই শোকে মাথা ন্যাড়া করে রাজার চুল কাটতে যায়। রাজা নাপিতকে বলল, তুমি ন্যাড়া করছ কেন? নাপিত বলল, রাজামশাই আমার মানকু মারা গেছে। রাজা বলল, আহা! তোমার মানকু মারা গেছে, তাহলে আমাকেও ন্যাড়া করে দাও। রাজার দেখাদেখি রাণীমা, উজির, উজিরের স্ত্রী, নাজির সকলে ন্যাড়া করল। কিন্তু বাঁধ সাধল নাজিরের স্ত্রী। সে বলল, যে মানকুর জন্য সবাই ন্যাড়া করছে আসলে সে মানকুটি কে? নাজির বলল, আমি তো জানি না, উজিরকে বলি। উজির বলল, আমি তো জানি না, রাজামশাইকে বলি। রাজামশাই বলল, সত্যিই তো যে মানকুর জন্য আমরা সবাই ন্যাড়া করছি সে মানকু কে তা তো জিজ্ঞেস করিনি। নাপিতকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল। মানকু তোমার কে ছিল? নাপিত জবাবে বলল, রাজামশাই আমি অবসর সময়ে তৈল মাড়াতাম। ঘানি টানার জন্য যে গরুটি ছিল তাকে আদর করে মানকু ডাকতাম। নাপিতের কথা শুনে সবাই বোকা বনে গেল। ঠিক একইভাবে আমাদের সমাজে নামে-বেনামে অনেক ইসলামী অনুষ্ঠান চালু আছে, যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে খুঁজে পাওয়া যায় না। ভালো মনে করে অথবা ইসলামেরই এক অঙ্গ জেনে আমরা তা পালন করে থাকি। আমাদের উচিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছে না থাকা চলমান আমলগুলো থেকে দূরে থাকা এবং সেটার গোড়ার কথা জানা। মানবজাতি বলতেই কমবেশি আবেগ বিদ্যমান থাকবে। বিশেষ করে আমাদের বাংলাদেশের লোকদের মধ্যে অতিরঞ্জিত আবেগ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন–হঠাৎ কিছু লোক কোন উদ্দেশ্যে মিছিল বের করল, মানি না, মানব না। সাথে পর্যায়ক্রমে যোগ দিল অনেক লোক। একজনকে প্রশ্ন করা হল, ভাই! এটা কিসের মিছিল? তখন মিছিলের সুরেই মিছিলকারী জবাব দেয়, জানি না, জানি না। আমেরিকার একজন পণ্ডিত বলেছিলেন– 'আবেগ দিয়ে জীবন পরিচালনা করা যায় না'। তবে সাময়িকভাবে জীবন পরিচালনা করা সম্ভব হলেও ইসলামের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন আমল এক মিনিটের জন্যও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না আল্লাহ্‌র দরবারে। এ ব্যাপারে সকল আলেমই একমত। কারণ আবেগে পড়ে কোন আমল করলে তা হবে লোক দেখানো, আর যদি কোন আমল লোক দেখানো হয়, তবে তা হবে শিরক বা হারামের অন্তর্ভুক্ত *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৩১৮)*।

অতএব প্রিয় মুসলিম মিল্লাত, আসুন! আমরা সকল প্রকার অহংকার, অহমিকা, হিংসা, আবেগ পরিহার করে একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য ইসলামের যে প্রধান উৎস কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তা অনুযায়ী জ্ঞানার্জন করে আমাদের আমল-আক্বীদা সংশোধন করি। আর না জেনে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক না করি এবং জানার পর তা আমান্য বা অবহেলা না করি। এই আবেদন রেখে একটি আয়াত পেশ করে ইতি টানছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ এবং তার রাসূল (ছাঃ) কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন কোন মত প্রকাশ বা ভিন্ন কোন আমল করার কোন ক্ষমতা নেই *(আহযাব ৩৬)*। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ অমান্য করে, সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হল *(আহযাব ৩৬)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার এবং একই ছাতার নিচে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন ছুম্মা আমীন!!

লেখক : তাবলীগ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, সিংগাপুর।

ঘুরে এলাম দার্জিলিং ও ভুটান

আব্দুর রশীদ

২০০৫ সাল। দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ মতিহারের সবুজ চত্বরে সগর্বে মাথা উঁচু করে থাকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে ভর্তি হয়েছি। জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে এসে হঠাৎই যেন নতুন নতুন অভিজ্ঞতার সাথে সাথে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতাও অনুভূত হতে লাগল। বাড়তে থাকল নানা অঙ্গনে অবাধ বিচরণ। আর সেই সূত্রেই দেশের সীমানা পেরিয়ে বিদেশের মাটিতে শিক্ষাসফর সম্পর্কে ধারণা পেলাম। মাস্টার্সে ভর্তি হয়েই বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বড়ভাইদেরকে শিক্ষাসফরে বিদেশভ্রমণের প্রস্তুতি নিতে দেখে আমাদের মনেও ব্যাগ্রতা সৃষ্টি হত যে, আমরা কখন মাস্টার্সে পড়ার সুযোগ পাব আর কখন সেই বিদেশভ্রমণের অভীপ্সিত মাহেন্দ্রক্ষণ আসবে। অতঃপর চোখের পলকে জীবনের ৫টি মূল্যবান বছর অতিক্রম করে অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম এবং ২০১০ সালে মাস্টার্সে ভর্তি হলাম। ক্লাস শেষ হবার কিছুদিন পূর্বে ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আসল সেই কাংখিত ঘোষণা। স্যারদের উৎসাহ আর আমাদের স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহের যোগসূত্রে আরবী বিভাগের ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমরাই দেশের বাইরে শিক্ষাসফরের সূচনা করলাম। শিক্ষাসফরের স্থান নির্ধারিত হয় ভারত, নেপাল ও ভুটান। শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. সেতাউর রহমানের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমে সহজেই পাসপোর্ট ও ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা সেরে কাংখিত সফরের দিন-তারিখ ধার্য করা হল– ১৭ই মে ২০১১ ইং, মঙ্গলবার। অবশ্য ভিসা জটিলতায় পরে নেপাল ভ্রমণের সিদ্ধান্ত স্থগিত করতে হয়। এই সফরে আমাদের সফরসঙ্গী ছিলেন আরবী বিভাগের প্রবীণ প্রফেসর একেএম শামসুল আলম স্যার এবং স্বপরিবারে জনাব ড. মুহাম্মাদ সেতাউর রহমান স্যার।

যাত্রা শুরু : ১৭ই মে ১১ মঙ্গলবার ফজর ছালাতান্তে ভোর ৬-টায় রাজশাহী বাস টার্মিনাল থেকে অনিক ট্রাভেলস যোগে আমরা রওয়ানা দিলাম। অতঃপর বেলা প্রায় ১০.৩০টা নাগাদ রংপুর টার্মিনালে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সকালের নাস্তা সেরে পূর্ব থেকে অপেক্ষমাণ মাইক্রোতে চড়ে সীমান্তবর্তী যেলা লালমনিরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। অতঃপর তিস্তা ব্যারেজ পেরিয়ে পাটগ্রামে পৌঁছে আমাদের স্যারের এক বন্ধুর বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে বুড়ীমারী বর্ডারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

সীমান্ত পেরিয়ে শিলিগুড়ি : বাংলাদেশের বুড়ীমারী নদীর ওপারে ভারতের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় ঝামেলা সেরে একটি ইন্ডিয়ান মাইক্রোতে চড়ে পড়ন্ত বিকালের গোধূলি এবং সান্ধ্যলালিমার মায়াময় সান্নিধ্যে থেকে কখনো জনাকীর্ণ প্রান্তর আবার কখনো বা উন্মুক্ত ফসলের মাঠ পেরিয়ে রাত ৯.৩০ নাগাদ পৌঁছে গেলাম বিখ্যাত শিলিগুড়ি শহরে। সেখানে 'তাজমহল' নামক হোটেলে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা হল। পরদিন ফজর ছালাতান্তে শিলিগুড়ি রেলওয়ে জংশনসহ পার্শ্ববর্তী পর্যটন কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনে গেলাম। হঠাৎ দেখি পশ্চিম দিগন্তে ঘনকালো মেঘ বিশাল এলাকা জুড়ে আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে আছে। মনে হচ্ছিল এখুনি এক পশলা বৃষ্টি নামবে। পরক্ষণেই বুঝতে পারলাম এ কোন মেঘের আস্তরণ নয়; বরং আমাদের সফরের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থান, ভয়ানক সৌন্দর্যের অপরূপ রাণী দার্জিলিং পাহাড়। মনে নানা কৌতূহল জাগতে লাগলো, আমরা কি আদৌ এই বিশাল উঁচু পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠতে পারবে? সেই পাহাড়ের চূঁড়ায় অবস্থিত মোবাইল টাওয়ার ও কারেন্টের খুঁটিগুলো সমতল থেকে ছোট্ট ও চিকন কলমের মত দেখাচ্ছে। ভাবতে ভাবতে ইতিমধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু ও সেতাউর রহমান স্যার ভ্রমণ প্যাকেজ ঠিক করে ফেলেছেন।

দার্জিলিং-এর পথে : কিছুক্ষণ বাদেই বেলা ১১-টার দিকে দুপুরের হালকা খাবার নিয়ে মাইক্রো যোগে আমরা রওয়ানা দিলাম দার্জিলিং-এর চূড়া ছোঁয়ার প্রত্যাশায়। রাস্তার দু'পার্শ্বে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, সবুজ-শ্যামল বনরাজি, ফুটন্ত ফুলের ঘন ঝোপ-ঝাড় আর গাছ-গাছালী, ফাঁকে ফাঁকে নয়নাভিরাম চা বাগানকে সঙ্গী করে গাড়ী ছুটে চলল অবিরাম। একটু পরেই শুরু হল ছোট-খাট, উচুঁ-নীচু টিলা ও পাহাড়ের অপরূপ সৌন্দর্য আর কমলা গাছের মনমাতানো দৃশ্য। রুদ্ধশ্বাসে এসব দৃশ্য উপভোগ করতে থাকলাম। আর গাড়ী কখনো পাহাড়ের গা ঘেঁষে আবার কখনো বা দুই পাহাড়ের গিরিপথ ভেদ করে সাপের মত পেচানো আর সমুদ্রের ন্যায় ঢেউ খেলানো উঁচু-নীচু পীচঢালা কালো রাস্তার উপর ছুটে চলা অব্যাহত রাখল। মহান আল্লাহ্‌র অপরূপ সৃষ্টিকর্ম আমাদের ঈমানী তেজকে যেন উত্তুঙ্গে পৌঁছে দিল আর মনের মাঝে সুরের ভুবন সৃষ্টি করল। ইতিমধ্যে দীর্ঘ দুই ঘণ্টার পথ চলতে চলতে আমরা 'মীরিখ' নামক এক পাহাড়ী শহরে পৌঁছে গেলাম। চতুর্দিকে পাহাড় বেষ্টিত একটি উন্নত শহর হল এই মীরিখ। এ শহরে রয়েছে উন্নতমানের পোষাক-সামগ্রীর মার্কেট, কাঁচামালের দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, পর্যটনস্থল, নিত্যপ্রয়োজনীয় রকমারী দ্রব্য ইত্যাদির ব্যাপক সমারোহ। শহরের পাশ দিয়ে এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে অনেক দূরে বয়ে গেছে ছোট একটি নদী। দুই পাহাড়ের মানুষের যোগাযোগের সুব্যবস্থা ও পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য রয়েছে আধুনিক স্টাইলে নির্মিত বেশ কয়টি পুল/ব্রিজ। মীরিখের সমতলভূমি ছাড়াও চতুর্দিকের পাহাড় কেটে কেটে ৫/৬ তলাবিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর অসংখ্য অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। মনে হচ্ছিল এ কোন সুদক্ষ শিল্পীর আঁকা এক মনোরম চিত্রকর্ম। সেখানকার স্থানীয় লোকজনদের মুখে শোনা গেল যে, অত্র অঞ্চলের গোর্খাল্যান্ডে স্বাধীনতাকামী সৈনিকদের ট্রেনিং দেয়া হয়, যা সমতল থেকে প্রায় ৮৭০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। বেলা প্রায় তিনটার দিকে মাইক্রো আমাদের নিয়ে পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা পথ বেয়ে আবার ছুটে চলল গন্তব্যস্থল দার্জিলিং-এর

দিকে। হঠাৎ শীতের আমেজে আমাদের শরীর শীতল হয়ে আসতে লাগল এবং যার যা শীতের পোষাক ছিল তা পরিধান করে নিল। এভাবে ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর আমাদের সামনে ছোট একটি বাজার পড়ল এবং সেখানে যানজট পরিলক্ষিত হল। জানতে পারলাম স্থানটির নাম পশুপাথী (এটি মূলত নেপাল সীমান্তবর্তী ভারতের একটি শহর)। একটু সামনে অগ্রসর হয়ে দুটি রাস্তা দেখলাম। যার একটি গেছে বাম দিকে অন্যটি ডান দিকে। বাম দিকের রাস্তাটি সোজা নেপালের মধ্যে ঢুকে গেছে। একজন নেপালী বর্ডারগার্ড রাস্তা ফাঁকা করে গাড়িগুলিকে পারাপারে সহায়তা করছে। তখন মনে হল যাক! নেপাল ভ্রমণ করতে না পারলেও নেপালের বর্ডার তো দেখতে পেলাম! দুধের সাধ ঘোলে মেটানো আর কি! যানজট ছাড়লে আমাদের গাড়ী আবার ছুটে চলল,পথিমধ্যে পাহাড়ী স্কুল-কলেজ পড়ুয়া অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী হাত নেড়ে নেড়ে আমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছিল, পাহাড়ের গা বেয়ে ধীরলয়ে আমরা এতটাই উপরে উঠতে থাকলাম যে, নীচে রেখে আসা পাহাড়ের গা ঘেঁষে গড়ে উঠা উঁচু উঁচু দালান-কোঠাগুলিকে ভাগাড়ে নিক্ষিপ্ত ময়লা-আবর্জনার কাগজ আর পলিথিনের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেখাচ্ছিল।

নীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলা তখন আমাদের থেকে অনেক অনেক নীচে পাহাড়ের গাছ-গাছালির উপর দিয়ে কখনও বা পাহাড়ের গায়ের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল। এ দৃশ্য দেখে আমাদের সেতাউর স্যারের মেয়ে ছোট্ট সোনামণি নাহাল তাহসিন বলে উঠল, "আব্বু! আমরা যখন আরো উপরে উঠে মেঘের ভিতর দিয়ে চলব তখন আমি হাত দিয়ে মেঘ ধরে ধরে তোমাদের সবার মুখে মাখিয়ে দিব।" তার কথা শুনে প্রফেসর শামসুল আলম স্যার তাকে ঠাট্টা করে বললেন, তুমি তো সবার ছোট, পাহাড়ে উঠতে পারবে না। নাছোড়বান্দা নাহলা ঠিকই জবাব দিল, 'আচ্ছা আব্বু, দাদুতো সবার বড় আর বুড়ো মানুষ; দাদুই তো পাহাড়ে উঠতে পারবে না। আমরা দাদুকে নীচে রেখে সবাই পাহাড়ে উঠবো।' ছোট্ট তাহসীন ও সবার মুরুব্বী প্রফেসর আলম স্যারের মাঝে এমন মধুর খুনসুটি পুরো সফরে আমাদের মাতিয়ে রাখতে প্রেরণাদায়ী রসদ যুগিয়েছিল। যাহোক বিকাল প্রায় সোয়া পাঁচটার দিকে সুখিয়া নামক শহর পার হয়ে দার্জিলিং-এ পৌছে গেলাম।

দার্জিলিং শহর : দার্জিলিংয়ের চারপাশ ঘিরে শুধু মেঘের মেলা। এ যেন এক মেঘপর্বত। পর্বতের গায়ে বেড়ে উঠেছে নানা প্রজাতির গাছ-গাছালী এবং গড়ে ওঠেছে হাজার হাজার ঘর-বাড়ি। আমাপ্যাকেজের মাধ্যমে পূর্বনির্ধারিত হোটেল 'এভারেষ্ট গ্লোরিষ্ট হোটেল'-এর পরিচালক ও হোটেল বয়রা সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাল এবং লাগেজসমূহ নিয়ে নির্ধারিত তলায় পৌছে দিল। আমরা ফ্রেশ হয়ে ছালাত ও নাস্তা সেরে শহরের দিকে বেড়াতে বের হলাম। হঠাৎ দেখি পাহাড়ের চারিদিকে গাছ-গাছালী এবং ঘর বাড়িগুলি নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বল করছে আর জোনাকি পোকার মত মিটিমিটি করে আলো ফুটছে। সন্ধ্যার পর বিদ্যুতের আলো সমগ্র পাহাড়টিকে এক অপরূপ শোভায় কারুকার্যখচিত করে তুলেছে। পাহাড় কেটে কেটে গড়ে উঠা হাজার হাজার বাড়ি-ঘর আর প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি যেন সুদক্ষ শিল্পীর তুলিতে আঁকা ছবির মত দেখাচ্ছিল। শত শত দেশী-বিদেশী পোশাকসামগ্রী আর নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দোকান-পাট, আর ৮/১০ তলা বিশিষ্ট আবাসিক হোটেলে ভরপুর শহরটি কেবল পর্যটকদের জন্যই নির্মিত মনে হল। পাহাড়ী শহর হলেও এখানে গ্যাস, মোবাইল, টেলিফোন টাওয়ার ইত্যাদি নাগরিক সুবিধাদি অত্যাধুনিক। শহর ঘুরে ফিরে এসে এক হোটেল বয়ের কাছ থেকে জানা গেল, এখানকার ৯৫ শতাংশ লোক শিক্ষিত। এমনকি সে নিজেই ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রী অর্জন করে এই এভারেষ্ট গ্লোরিস্ট হোটেলে প্রাকটিস করেছে। পরদিন ভোরে সূর্যোদয় দেখার জন্য 'টাইগার হিল' যাওয়ার নিয়তে রাতের খাবার সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর প্রায় ৪-টার দিকে হোটেলবয় আমাদেরকে জাগিয়ে দিলেন। আমরা প্রস্তুতি নেব ঠিক এমন সময় চতুর্দিক থেকে ভেসে আসা ফজরের আযানের সুমধুর ধ্বনি আমাদেরকে বিমোহিত করল। শত শত ফুট উচ্চতায় উঠে এমন এক বিধর্মী পাহাড়ী শহরে যে ফজরের আযান প্রতিধ্বনিত হবে তা কখনো কল্পনাই করিনি। সাথে সাথে আমরা আল্লাহ্র প্রশংসায় আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করলাম।

টাইগার হিল : ফজরের ছালাত আদায় করে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার জন্য একটি দ্রুতগামী মাইক্রোতে আরোহন করলাম। গাড়ী আমাদের নিয়ে ভোরের নীরব আলো-আঁধারী আর মৃদু-মন্দ বাতাসের মধ্য দিয়ে ছুটে চলল। সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণে ভোরের আকাশ কিছুটা ফর্সা হতে না হতেই দেখলাম নীল আকাশের শুভ্র মেঘের ভেলা যেন বরফখণ্ডের মত জমাট বেঁধে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গাছ-গাছালীর কোলে নোঙর করে আছে। এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম টাইগার হিলে। হিমালয় আর কাঞ্চনঝঙ্গার চূড়ায় সূর্যোদ্বয়ের অপরূপ আলোক ঝলকানীর মূহূর্তটি উপভোগ করার জন্য টাইগার হিলে তখন শতশত গাড়ী আর হাজার হাজার মানুষের সমাগম। সবকিছুই প্রস্তুত। কিন্তু দুর্ভাগ্য! কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া আর হালকা মেঘাচ্ছন্ন আকাশের কারণে সে দৃশ্য ভালভাবে

উপভোগ করতে পারলাম না। তবে খুব কাছ থেকে হিমালয় পর্বত দেখার অভিজ্ঞতা হল।

ঘুম মন্দির ও বাতসিয়া ইকোপার্ক : তারপর সেখান থেকে আরো কয়েকটি দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের জন্য ছুটে চললাম। কিছু পথ অগ্রসর হতেই রাস্তার বাম দিকে দেখলাম 'ঘুম মন্দির' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এক বিরাট বড় মঠ। এই মঠের নির্মাণকাল সম্পর্কে কোন তথ্য সেখানে নেই। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য যুগ যুগ থেকে তারা এভাবেই গির্জাটিকে দেখে আসছে। কর্তৃপক্ষ মন্দিরটিকে সবসময়ের জন্য ফুলের গাছ আর কাগজের তৈরী ফুল আর কৃত্রিম কারুকার্যে সুসজ্জিত করে রেখেছে। মন্দিরের প্রবেশপথের ডান দিকে বিশাল বড় এক ঘণ্টা রয়েছে। ভিতরে সমস্ত ঘর জুড়ে ছাদ থেকে মাটি পর্যন্ত এক বিশাল বুদ্ধ মূর্তি। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা মূর্তিটির সামনে মাথা নত করছে এবং পাপ মোচনের আশায় স্ব-স্ব হস্তে ঐ ঘণ্টাটিকে সবসময় ঘুরাচ্ছে আর মাঝে মধ্যেই সেটি টুংটুং করে বেজে উঠছে। মন্দির পরিদর্শন শেষে আমরা 'বাতসিয়া ইকো পার্কের' উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। ছোট একটি ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় আধুনিক স্টাইলে নির্মিত ও সুন্দর

ফুলবাগান বেষ্টিত এ পার্কটি থেকে বাইনোকুলারের মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী তিনটি দেশ তথা চীন, নেপাল ও ভুটান খুব ভালভাবে দেখা যাচ্ছিল। সেখান থেকে আমরা 'রকগার্ডেন'-এর দিকে যাত্রা করলাম।

রক গার্ডেন : টাইগার হিল পেরিয়ে নাম না জানা আরো কয়েকটি বিরাট উঁচু উঁচু পাহাড় হতে সাপের মত পেচানো সরু-চিকন রাস্তা বেয়ে বেয়ে আমাদের মাইক্রোবাস নামতে লাগল। বহু উপর থেকে অপর পাহাড়ের দিকে তাকালে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল সাদা সরু

ফিতার মত কি যেন একটা পাহাড়ের উপর থেকে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেছে। কৌতূহলী হয়ে উঠলাম কি হতে পারে ওটা? অবশেষে আমরা যখন নীচে নেমে আসলাম, তখন দেখলাম এটিই সেই পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ঝরনার পতনস্থল। যাকে একটি পর্যটন স্পটে পরিণত করে নাম দেয়া হয়েছে 'রকগার্ডেন'। একদিকে আল্লাহ্র অপরূপ সৃষ্টি অবিরল ধারায় প্রবাহিত ঝরনা, অপরদিকে নানান

কিসিমের পাহাড়ী ফুল ও বাগ-বাগিচা গার্ডেনটিকে আরো বেশী শোভামণ্ডিত মনোহরী করেছে। আমরা ঝরনার উৎসমুখের খোঁজে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকলাম। কিন্তু অনেক উপরে উঠেও তার নাগাল পেলাম না। সেখান থেকে নামার সময় হঠাৎ চোখে পড়ল গুহা সদৃশ একটি ভয়ঙ্কর স্থান। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা পাহাড় কেটে গুহা সদৃশ এ স্থানটিকে তাদের উপসানালয়ে পরিণত করে নানা মূর্তি স্থাপন করেছে। রক গার্ডেনের পাশ দিয়ে হেঁটে কিছুদুর গেলেই নেপালের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকা। এরপর আমরা টি গার্ডেন-এর দিকে ছুটে চললাম। সেখানে পৌঁছে দেখলাম পাহাড়ের সুবিস্তৃত এলাকা জুড়ে শুধু চা বাগান আর চা বাগান। একদিকে পাহাড়ের উপর স্তরে স্তরে লাগানো নানা প্রকার চা গাছ, অপরদিকে বাগান ঘেঁষে ভাসমান সাদা মেঘের লুকোচুরি টি গার্ডেনটিকে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছে। সবকিছু পরিদর্শন শেষে সারাদিনের ভ্রমণক্লান্তি নিয়ে আমরা আবার ফিরে আসলাম আমাদের থিতুস্থল হোটেল এভারেস্ট গ্লোরিস্টে।

লাভা : পরদিন সকালের নাস্তা সেরে রওয়ানা হলাম 'লাভা' পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, কিছুদূর যেতেই পথে এক জায়গায় প্রায় দুই ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়ায় আমাদেরকে পথ পরিবর্তন করে অন্য পথে যেতে হল। ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে করতে হঠাৎ এমন এক স্থানে পৌঁছলাম যেখান থেকে আমরা 'সিকিম' ও 'গ্যাংটক' পাহাড়ের আংশিক দৃশ্য দেখতে পেলাম। সেখান থেকে

নামতে নামতে তিনটি পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে বয়ে চলা তিস্তা ও রঙ্গীত নদীর মোহনায় পৌঁছে সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ক্যামেরাবন্দী করে আবার যাত্রা করলাম। বেশ কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করে বেলা ৩টার দিকে আমরা পৌঁছে গেলাম "লাগ" শহরে। বিকালে শহরটির বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে পরদিন সবচাইতে মনোরম ও আকর্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্যে ভরপুর 'বিশপ' পাহাড় দেখতে গেলাম। 'বিশপ' পাহাড়ে পৌঁছে দেখলাম সত্যিই আল্লাহ স্থানটিকে যেন এক অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছেন। পাহাড়টির যত উপরে উঠা যায় ততই দেখা যায় যে, শুভ্র সুন্দর মেঘমালা ঘর-বাড়ী ও গাছ-পালার গা বেয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। উপরে উঠতে উঠতে হঠাৎ এক স্থানে দেখি পুকুরপাড়ে ইঁদুরের গর্ত থেকে মাটি পড়ার মত পাথর পড়ছে। পাহাড়ী গাছ-গাছালী আর মাটির সুড়ঙ্গের ফাঁক দিয়ে ছোট-বড় পাথর অবিরত পড়তেই আছে এবং জীবিকা নির্বাহের তাগিদে এক শ্রেণীর মানুষ সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। দিনটি শুক্রবার হওয়ায় জুম'আর সময়ের পূর্বেই আমরা লাভায় ফিরে আসলাম। কিন্তু দার্জিলিংয়ের মত এখানে কোন মসজিদ না থাকায় হোটেল কর্তৃপক্ষের পরামর্শে একটি বড় রুমে আমরা জুম'আর খুৎবা ও ছালাত আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আযান শেষে প্রফেসর শামসুল আলম স্যার 'পাহাড় ও

পর্বতমালা পৃথিবীর জন্য পেরেক রূপে সৃষ্টি'-এ বিষয়ের উপর এক হৃদয়গ্রাহী খুৎবা প্রদান করলেন। মসজিদবিহীন এই দুর্গম লাভা পাহাড়ের ইতিহাসে জুম'আর ছালাত আদায়ের ঘটনা হয়তোবা এটিই প্রথম বলে আমাদের ধারণা। যেন নতুন ইতিহাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

লোলেগা : বিকালে অপর একটি মাইক্রোবাসযোগে নিঃসীম নীলিমা ভেসে বেড়ানো মেঘের ভেলা আর পাহাড়ী বনভূমির মিলনস্থল লোলেগা (Lolegaon)-র উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। লোলেগা যাওয়ার রাস্তাগুলি এমনই উঁচু-নীচু ছিল যে, নিম্নগামী হওয়ার সময় ড্রাইভার গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে শুধু নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করছিল। পথিমধ্যে স্থানে স্থানে পাহাড়ী গরু-ছাগলের পালকে ভীড় জমিয়ে লতা-পাতা খেতে দেখা গেল। অবশেষে লোলেগা পৌঁছে গাড়ী থেকে নামতেই পায়ে জোঁক লাগলো। হালকা বৃষ্টিতেই এখানে জোঁকের উপদ্রব দেখা যায়। পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সেই শ্বেত-শুভ্র মেঘ অবারিত ভেসে বেড়াচ্ছে, আর আমরাও সেই মেঘের ভিতর দিয়ে মনের আনন্দে চলাফেরা করছিলাম। মনে হচ্ছিল যেন আমরা আকাশের সাথে মিশে গেছি। ঘুরতে ঘুরতে গভীর জঙ্গলে গিয়ে এক ঝুলন্ত ব্রিজ

দেখলাম। অত্যন্ত কষ্ট করে সেই ব্রিজে আরোহন করলাম। আবার সেখান থেকে নেমে গাড়ীর নিকটে পৌঁছতেই তাহসীন তারস্বরে বলে উঠে 'আম্মু! আম্মু! তোমার পায়ে জোঁক!' ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওর বাবা

জোঁক খুঁজলেন কিন্তু পেলেন না। তখন তিনি এমন ভয় দেখানোর জন্য মেয়েকে বকা দিতে গেলে তাহসীন যথারীতি নাটুকে ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'যে যে জিনিসের ভয় করে তাকে সেটাই গিফ্‌ট করতে হয়'। অবশেষে 'কাফির' নামক এক গ্রামীণ হাট সদৃশ্য মার্কেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন শেষে লোলেগা ফিরে আসলাম।

ভুটান : পরদিন সকালে জয়েগা ও ভুটানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। পাহাড়ী ভূখণ্ড দার্জিলিং লাগ আর লোলেগার পাদদেশ দিয়ে হাজার হাজার একর বাগানের মধ্য দিয়ে বয়ে চলা পিচঢালা পথ ধরে প্রথমে আমরা জয়েগা পৌঁছে গেলাম। সময় স্বল্পতার কারণে গাড়ী থেকেই জয়েগার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে 'ভুটান' সীমান্তের বিশাল গেটের নিকট উপস্থিত হলাম। গেট দিয়ে গাড়ীতে একসঙ্গে ৮ জনের বেশী প্রবেশ করার নিয়ম না থাকায় কয়েকজন বন্ধুকে হোটেলে

আসতে বলে আমরা ভুটানের ভিতরে ডুকে পড়লাম। বিশ্ব মানচিত্রের ইতিহাসে ভুটান অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড হলেও চতুর্দিকে পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত ও স্বায়ত্তশাসিত একটি সুপরিচিত রাষ্ট্র। ভারতীয় নাগরিকত্ব থাকলেই এখানে অনায়াসে চলাফেরা করা যায়। কোন পাসপোর্ট, ভিসার প্রয়োজন হয় না। এখানকার শহরগুলি অত্যন্ত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। রাস্তা-ঘাটগুলি যানজট ও জনকোলাহল মুক্ত। বিল্ডিংগুলো প্রাচীন স্টাইলের হলেও আধুনিক সাজে-সজ্জিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নির্ধারিত ইউনিফর্ম ও কঠোর নিয়ম-কানুনের ভিত্তিতে পরিচলিত। মার্কেটগুলোতে দেশীয় ও ভারতীয় উভয় মুদ্রা উভয়ই প্রচলিত। শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শেষে আমরা আবার ইণ্ডিয়ায় ফেরৎ আসলাম এবং কলকাতা যাত্রার উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

কলকাতা : ২১ শে মে আমরা রওয়ানা দিলাম কলকাতার উদ্দেশ্যে। নিউ জলপাইগুলি জংশন থেকে রাত ৯-টার 'কাঞ্চনঝঙ্গা' ট্রেনে চড়ে রাতের মৃদু-মন্দ বাতাস, ঝিঁঝি পোকার সুরেলা ঐক্যতান, ফসলে ভরপুর বিশাল বিস্তীর্ণ প্রান্তর, ফারাক্কা ব্রীজ ইত্যাদির সঙ্গী হয়ে দীর্ঘ রাত অতিক্রম করলাম এবং সকাল ৮-টার দিকে পৌঁছে গেলাম 'হাওড়া' রেলওয়ে জংশনে। অতঃপর সেখান থেকে কলকাতা শহর। স্থানীয় এক হোটেলে উঠে বিকালে শহরের বিভিন্ন স্থান, ফিস মিউজিয়াম, চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়াল পার্ক, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি পরিদর্শন শেষে পাতাল ট্রেনে চড়ে হোটেলে ফিরে আসলাম। পরদিন কলকাতা ইউনিভার্সিটি, কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা ও প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভিন্ন অনুষদ, ভবন ও ডিপার্টমেন্ট পরিদর্শন শেষে ট্রামে (দুই বগিবিশিষ্ট বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন যা সড়ক পথে নির্মিত রেল লাইনের উপর দিয়ে বাস মাইক্রো ট্যাক্সি ইত্যাদির সাথে একই পথে চলাচল করে) চড়ে ফিরে আসলাম।

ক্লান্ত মুসাফিরের নীড়ে প্রত্যাবর্তন : সেদিনই রাত ৮-টায় আবার 'কাঞ্চনঝঙ্গা' ট্রেন যোগে ফিরতি যাত্রা করে পরদিন সকালে নিউ জলপাইগুড়ি এসে পৌঁছলাম। অতঃপর সেখান থেকে মাইক্রোতে করে চন্দ্রাবান্ধা বর্ডারে আসলাম। এখানে পাসপোর্ট ও ভিসার কাজ সেরে বাংলাবান্ধায় এসে মাইক্রোতে চড়ে কিছুদূর আসতেই হঠাৎ ছোট-খাটো একটা এক্সিডেন্টে মাইক্রোটির এক কোণা উল্টে গেল তবে আমাদের কার কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। পরে আরেক মাইক্রোতে সৈয়দপুর এসে তিতুমীর এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে রাজশাহী ফিরে আসলাম বহু অভিজ্ঞতার ভারে নুজ হয়ে।

লেখক : কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

যুবসংঘ : আমার চেতনা, আমার প্রেরণা

-অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' একটি নাম, একটি আন্দোলন, একটি চেতনা, একটি প্রেরণা; যে সংগঠনের রূপকার ও প্রতিষ্ঠাতা **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** তিনি আমার জীবনে সকল প্রেরণার উৎস ও মহান দীক্ষাগুরু। তাঁর পুণ্যময় সংস্পর্শ, অতুল্য আদর্শ ও গতিশীল নেতৃত্ব আমার জীবনে এককভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তাই তাঁকে ঘিরে অমলীন হয়ে থাকা কিছু 'স্মৃতিকথা' দিয়ে গাঁথলাম এই পুষ্পমাল্য।

সূত্রপাত : ১৯৭৫ সালের মার্চ মাস। গোদাগাড়ী থানার ঝিনা ইসলামিয়া মাদ্রাসায় ঘটনাক্রমে তালেবুল এল্ম হয়ে পড়তে গেলাম। মাদ্রাসা পরিচালনা পরিষদের সদস্য মাষ্টার আব্দুল খালেক সাহেব (বর্তমানে আন্দোলনের শূরা সদস্য) তখন সাপ্তাহিক আরাফাত পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ধার নিয়েই সর্বপ্রথম এই পত্রিকা পাঠের সুযোগ পেয়েছিলাম। পাড়া-গাঁয়ে তখন আরাফাত পত্রিকার বেশ কদর ছিল। ছাত্র-শিক্ষকদের আগ্রহের কারণে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আরাফাত পত্রিকা নিয়মিতভাবে পাঠের ব্যবস্থা করলেন। বিকেলে মাদ্রাসার খোলা মাঠে বসে আমরা আরাফাত পত্রিকার খুঁটি-নাটি বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতাম। ১৯৭৫-৭৬ সনের কথা। আরাফাত পত্রিকার প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একজন নিবন্ধকার নিবন্ধ লিখতেন। তাঁর নাম মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। মূলতঃ আরাফাত পত্রিকায় লেখা পড়েই তাঁর নামের সাথে প্রাথমিক পরিচয় ঘটে। সে সময় বরং তাঁকে না দেখেই, না জেনেই তাঁর প্রতি এক প্রকার অনুরাগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। কিছুদিন পর পাকড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক মাওলানা আবুল কালাম আযাদ আমাদের নিকট তাঁর পরিচিতি পেশ করে বললেন, আসাদুল্লাহ আল-গালিব আমার ক্লাসমেট ছিলেন। আরামনগর আলিয়া মাদরাসা থেকে আমরা এক সঙ্গে কামিল পাশ করেছি। তাঁর পিতা মাওলানা আহমাদ আলী প্রণীত 'আকীদায়ে মুহাম্মাদী বা মাযহাবে আহলেহাদীছ', 'সংসার পথে' প্রভৃতি পুস্তক ইতিমধ্যে সৌভাগ্যক্রমে আমার সংগ্রহে এসে গেছে। খুলনা-যশোর যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের সহ-সভাপতি ও আমার প্রিয় লেখকের পিতা মাওলানা আহমাদ আলী এরই মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আরাফাতের মাধ্যমে সে সংবাদ আমরা পেতে থাকি। বিশেষভাবে জমঈয়ত সভাপতি জনাব ড. আব্দুল বারী একবার তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন, সেখবর আরাফাতে ফলাও করে প্রকাশিত হয়েছিল। সে খবর আজও মনে পড়ে। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল/মে মাস হবে। পাবনা আরিফপুর ঈদগাহ ময়দানে জমঈয়তে আহলেহাদীছের জাতীয় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে। আরাফাত পত্রিকার বর্ধিত পৃষ্ঠায় আমন্ত্রিত ওলামায়ে কেরামের তালিকায় মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব (যেলা খুলনা)- এই নাম বিজ্ঞাপিত হতে দেখলাম এবং পাবনা কনফারেন্স গিয়ে তাঁর সাক্ষাত পাব, এই আশায় বুক বাঁধলাম। কিন্তু কনফারেন্সে গিয়ে হতাশ হলাম। কনফারেন্সে তিনি যোগদান করতে পারেননি। অনুমান করেছিলাম হয়ত স্বীয় পিতার অসুস্থতার কারণেই কনফারেন্সে যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ৭৬-এর জুন মাসে তাঁর বুযুর্গ পিতা মৃত্যুবরণ করেন। সাপ্তাহিক আরাফাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রথম সাক্ষাৎ : ঢাকায় তাঁর সাথে আমার সাক্ষাতের ঘটনাটি আমার জীবনের একটি মধুরতম স্মৃতি হয়ে আছে। ১৯৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাস। জীবনের প্রথম ঢাকায় গিয়েছি। প্রয়াত শিক্ষক ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানীর হাতে লেখা পরিচয়পত্র নিয়ে ৭৬, কাজী আলাউদ্দীন রোডের আরাফাত অফিসে আশ্রয় নিয়েছি। সেদিন নাজিরাবাজার মসজিদে মাগরিবের ছালাত আদায়ের পর বারান্দায় দাঁড়িয়েছি। এ সময় পাতলা ছিপছিপে বিস্কুট রঙের পাঞ্জাবী পরা একজন সৌম্যদর্শন যুবক বারান্দায় এক পাশে রাখা সাইকেলে হাত রাখলেন। উভয়ের মাঝে দৃষ্টি বিনিময় হল। অতঃপর ছালাম-মুছাফাস্তে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাই, আপনার বাড়ী কোথায়?' বললাম, রাজশাহী। আমিও জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, আপনার বাড়ী কোথায়? বললেন, আমার বাড়ী খুলনায়। বললাম-আপনি কি খুলনার আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে চিনেন? মৃদু হেসে তিনি বললেন, হ্যা ভাই, আমিই তো আসাদুল্লাহ আল-গালিব। আমার নাম জানলেন কীভাবে? বললাম, আরাফাতে আপনার লেখা পড়ে। উনি বললেন, আমি মহসিন হলে থাকি, সময় পেলে এখানে ছালাত পড়তে আসি। সেদিনের সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতার সব কথা এখন মনে নেই। তবে সেসময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মহসিন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলেন। আর এটা ছিল যুবসংঘ প্রতিষ্ঠার চার মাস পূর্বের ঘটনা।

যুবসংঘ প্রতিষ্ঠা : ৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই আমি ময়মনসিংহের ত্রিশাল চক পাঁচপাড়া মাদরাসায় ভর্তি হই। ৭৮ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী মাননীয় মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে আহ্বায়ক করে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' গঠিত হয়। দেশব্যাপী দ্রুতগতিতে শাখা গঠনের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়, যা তখনকার দিনে আরাফাত পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট দ্বারা আমরা অবগত হতে থাকি। আহলেহাদীছ যুবসমাজ ও ছাত্রদের মাঝে 'যুবসংঘ' সেসময় যে উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস ও নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, তা কেবল 'মরা গাঙ্গে নতুন জোয়ার'-এর সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। প্রিয় মানুষের নেতৃত্বে গড়া সংগঠনের কথা শোনামাত্র আমি ও আমার সহপাঠীরা শতগুণ উৎসাহ নিয়ে সংগঠনে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিলাম। আমাদের চক পাঁচপাড়া মাদরাসায় শাখা গঠিত হল। রাজশাহীতে রাণীবাজার মাদরাসা ইশা'আতে ইসলাম-এ প্রথম শাখা গঠিত হয়। ছুটিতে বাড়ী এসে আমি নিজ গ্রাম রাজশাহী, মোহনপুরের জাহানাবাদে শাখা গঠন করেছিলাম। যা ছিল রাজশাহী যেলায় গ্রামাঞ্চলের মধ্যে গঠিত যুবসংঘের প্রথম শাখা।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ : সম্ভবত ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাদরাসার বার্ষিক জালসায় যোগদান ও সাংগঠনিক কাজে মাননীয় আহ্বায়ক সাহেব চক পাঁচপাড়া গেলে সেখানে দ্বিতীয়বারের মত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার ছাত্র ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ময়মনসিংহের আব্দুল হাফিয ভাই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর উদ্যোগে প্রথম ঢাকায় যে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা আরো এক বছর পূর্বেই ১৯৭৯ সালের মে বা জুন মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। যা বিজ্ঞপ্তি আকারে আরাফাতে প্রকাশিত হয়েছিল। নির্ধারিত তারিখে সম্মেলনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আমরা ঢাকা গেলাম। উত্তর যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসায় আহ্বায়কের রুমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি আমাদের জানালেন, অনিবার্য কারণে সম্মেলন স্থগিত করা হয়েছে। একটি সাদা খাতায় জীবনের প্রথম রচিত কিছু সাহিত্যকর্ম তাঁকে দেখালাম। দেখে খুশি হলেন এবং দো'আ করলেন। যুবসংঘের 'গঠনতন্ত্র' বা 'কর্মপদ্ধতি' কিছুই তখন পর্যন্ত প্রণীত হয়নি। তাই যুবসংঘের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পাঁচটি মূলনীতি আমার সেই খাতায় তিনি লিখে দিয়েছিলেন। কথা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ যিয়ারত হোসেনের খুলনার বাড়ীর ঠিকানাটিও লিখে দিয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শবেবরাতের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে যিয়ারত হোসেন তাঁর উপর ক্ষিপ্ত আচরণ করে। কিছুদিন পর

তাঁর কাছেই যিয়ারত হোসেন আহলেহাদীছ হয়ে যান। সেই খাতাটি স্মৃতিস্বরূপ আমি আগলে রাখি। দু'বছর পর ১৯৭৯ সনের আগষ্ট মাসে আমি রাজশাহী চলে যাই। এ সময় যুবসংঘের কর্মী হিসেবে মাননীয় আহ্বায়কের সঙ্গে পুরোদমে পত্র যোগাযোগ চলছিল। রাজশাহীর মোহনপুর থানার পিয়ারপুর, মহব্বতপুর, মেলান্দি, সিন্দুরী প্রভৃতি গ্রামে এবং গোদাগাড়ী থানার ঝিনা, উপরবিল্লী, নামোবিল্লী, খটন্দর, আলোকছত্র, প্রসাদপাড়া প্রভৃতি গ্রামে এসময় আমি যুবসংঘের শাখা গঠন করে উত্তর যাত্রাবাড়ীর কেন্দ্রীয় অফিসের ঠিকানায় প্রেরণ করি। উপরবিল্লীর শ্রদ্ধেয় মাষ্টার আব্দুল খালেক ও ঝিনার মোসলেম ভাইকে এই সময় আমিই প্রথম যুবসংঘের দাওয়াত দিয়ে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করেছিলাম। ১৯৮০ সালে আমি বগুড়া সোনাতলা নাজির আখতার কলেজে ভর্তি হলাম। সোনাতলার মধুপুর গ্রামে ওসমান গণি ভাইকে আহ্বায়ক করে যুবসংঘের শাখা গঠিত হল। যেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে সাইনবোর্ড লাগিয়ে অফিসঘর তৈরী করা হল। পার্শ্ববর্তী গ্রামেও যুবসংঘের দাওয়াতী কাজ চলতে লাগল। ১৯৮১ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসের কথা। হুয়াকুয়া গ্রামে বগুড়া যেলা জমঈয়তে আহলেহাদীছের কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী থেকে জমঈয়তের সহ-সভাপতি ডঃ আফতাব আহমাদ রহমানী প্রধান অতিথি ও যুবসংঘের মাননীয় সভাপতি মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। আমি যুবসংঘ সভাপতির সঙ্গে দেখা করে বর্তমান অবস্থা অবহিত করলাম। তিনি কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৯৮২ সাল এইচএসসি পাশ করার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ভর্তি ও বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে সর্বতোভাবে তিনি আমাকে সহযোগিতা করেন। এজন্য কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁর কথা স্মরণ করি। প্রসঙ্গত, এ সময় গালিব স্যার শহীদ শামসুজ্জোহা হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে হলে থাকতেন। এটা ১৯৮২/৮৩ সালের কথা। জোহা হলের আবাসিক ছাত্র ও আমার ক্লাসমেট যশোরের মনিরুল ইসলাম এ সময় যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। স্যার তাঁকে খুব স্নেহের চোখে দেখতেন। স্যারের রুমে আমি মাঝে-মধ্যে যেতাম। দেখতাম, স্যারের জনৈক ভাগিনা (রুহুল আমীন) যিনি ভূ-তত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের ছাত্র ছিলেন, স্যারের নিকট থেকে ইংলিশ মিডিয়ামের পাঠ্যবইয়ের পড়া বুঝিয়ে নিতেন। ১৯৮৪ সালের ৩০ মে যুবসংঘের কেন্দ্রীয় অফিস ঢাকা থেকে রাজশাহী রাণীবাজার মাদ্রাসা মার্কেটে (৩য় তলা) স্থানান্তরিত হওয়ার আগে এ বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য রাজশাহীতে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সে বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে মনিরুল ইসলাম, সিরাজ ভাই (যশোর) ও আমি উপস্থিত ছিলাম। রাণীবাজারে অফিস স্থানান্তরের সময় কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক পদে সিরাজুল ভাই, তাবলীগ সম্পাদক পদে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-এর এনামুল হক এবং দফতর সম্পাদক পদে আমার দায়িত্ব ছিল। এনামুল হক ও আমি মাদ্রাসা মার্কেটের অফিসেই থাকতাম। কিন্তু মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অনুদারতার কারণে সেসময় আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সময় সাংগঠনিক সফরে পাবনা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রাম শালগাড়িয়া, খয়েরসূতী প্রভৃতি শাখা গঠনের কথা মনে আছে। মনে পড়ে, সে সময় রবিউল ইসলাম ভাই ও মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইনের সক্রিয় সহযোগিতা দানের কথা। মনে পড়ে বগুড়া সদর থানার বুকুষ্টিয়া, কামারপাড়া, ডেমাজানী প্রভৃতি গ্রামে সংগঠনের প্রথম দাওয়াত পৌঁছানো ও শাখা গঠন করার কথা। এ ছাড়াও সোনাতলা, শিবগঞ্জ ও অন্যান্য এলাকায় সফর করেছিলাম। রংপুর শহরের সেন্ট্রাল রোডের মাদরাসা দারুলহাদীছ সালাফিইয়াতে তখন যুবসংঘের শাখা ও কার্যক্রম ছিল। মাদরাসার ছাত্র আব্দুস সাত্তার সক্রিয় কর্মী হিসাবে আমাকে সহযোগিতা করেছিলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হারাগাছ বন্দরে গিয়েছিলাম। হারাগাছ বন্দরে কয়েকটি মসজিদে শাখা গঠন করা হয়েছিল এবং মুছল্লীদের মাঝে সংগঠনের দাওয়াত পৌঁছানো হয়েছিল। হারাগাছ বায়তুল মা'মূর মসজিদের তৎকালীন ইমাম মাওলানা লুৎফর রহমান আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন, যিনি গালিব স্যারের কামিলের ক্লাসমেট ছিলেন। সেসময় রাজশাহী যেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাংগঠনিক সফরে গিয়েছি। সত্য কথা বলতে কি, এখন যেভাবে 'আন্দোলনকে বুঝেছি, সে সময় তা না বুঝা অন্যদিকে আর্থিক টানাপোড়েনের ঠুনকো অজুহাতে বেশ কিছুদিন সংগঠন থেকে নিষ্ক্রিয় ছিলাম। কিন্তু সংগঠন ও সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি আন্তরিক আবেগ ও আকর্ষণ আর শুভ কামনার ঘাটতি কখনই ছিল না। যুবসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন ও প্রতিষ্ঠাপরবর্তী নাম জানা-অজানা অনেক সাথী ও বন্ধুরা আজও জীবিত আছেন; যাদের অনেকে আবার সংগঠন থেকে ছিটকেও পড়েছেন। কিন্তু শূন্যস্থান কখনও অপূর্ণ থাকেনি। আল্লাহ তা'আলা সময়মত যোগ্য উত্তরসূরী দিয়ে শূন্যস্থানগুলো পূরণ করেছেন এবং আগামীতেও পূরণ করে যাবেন-এ আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ্র দ্বীনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৯৪ সালে যেদিন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নির্দিষ্ট ইমারতের অধীনে পদযাত্রা শুরু করেছিল, সেদিন থেকে ইমারতের অধীনে বায়আত গ্রহণপূর্বক আমীরে জামা'আতের ইসলামী শরী'আত সম্মত যে কোন নির্দেশ বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছি এবং তাঁর নেতৃত্বে জামা'আতবদ্ধ জীবনযাপনে সচেষ্ট রয়েছি। জানি না কতদূর দায়িত্ব পালন করতে পারছি, তবে যতটুকু করেছি তা যেন আল্লাহ তাঁর দ্বীনের খেদমতে কবুল করে নেন- এই প্রার্থনাই করছি নিরন্তর। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে এদেশের পথভোলা মানুষের কাছে যেন জান্নাতের রাস্তা উন্মুক্ত করে দেন এবং আমাদের পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করেন। আমীন!!

■ *সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ,*
পিরোজপুর সাংগঠনিক যেলা

কুষ্টিয়া (পূর্ব) যেলায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের সূচনা

মোঃ হাশিম উদ্দিন সরকার

১৯৭৬ সাল। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত স্বাধীন বাংলাদেশের যুবসমাজ তখন উদ্ভ্রান্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমরা এলাকার কতিপয় যুবক এই অবস্থায় ঈমান-আক্বীদা রক্ষার উদ্দেশ্যে একত্রিত হলাম নন্দলালপুর আহলেহাদীছ মসজিদে। দীর্ঘ আলোচনার পর আলহাজ্জ মুস্তাকীম হোসেন সাহেবকে সভাপতি করে একটি যুব সংগঠনের বীজ বপন করা হয়। যার নামকরণ করা হয় 'নন্দলালপুর আহলেহাদীছ যুব পরিষদ'। এই সংগঠনের উল্লেখযোগ্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ মকিলউদ্দিন বিশ্বাস, ছানাউল্লাহ, আবুল কালাম আজাদ, আব্দুল বাকী, আবুল কাসেম, নিযামুদ্দীন, আব্দুর রশীদসহ আমরা অনেকেই। আমাদের একটি লাইব্রেরী ছিল। সাড়ে তিনশতের অধিক বই ছিল এখানে। বইগুলো সংগ্রহ করা হয়েছিল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আহলেহাদীছ আলেমগণের ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকে এবং 'আরাফাত' পত্রিকার অফিস লাইব্রেরী থেকে। আমরা প্রতিদিন বাদ আছর পাঠাগারে জমায়েত হতাম এবং নিয়মিত বই পড়তাম। আমাদের প্রধান কাজ ছিল সমাজ থেকে শিরক ও বিদ'আত দূর করা। এভাবেই এগিয়ে চলছিল আমাদের কার্যক্রম। ঠিক এমন এক মুহূর্তে ১৯৮০ সালে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ হতে মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্বাক্ষরিত প্রথম বার্ষিক কনফারেন্সের একটি দাওয়াতপত্র

পেয়ে আমি নিজে এবং আবুল কালাম (বর্তমান কুষ্টিয়া পূর্ব সাংগঠনিক জেলা আন্দোলনের সভাপতি) ঢাকা গমন করি এবং আমাদের বর্তমান অবস্থান, সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদের যাবতীয় নথিপত্র মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে দেখান হয়। তিনি আমাদের কার্যকলাপ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং আমাদেরকে যুবসংঘের অর্ন্তভুক্ত করে নেন। এইভাবে আমরা যুবসংঘের সাথে জড়িয়ে পড়লাম। কিন্তু সাংসারিক ব্যস্ততার কারণে আমরা সংগঠন থেকে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়ি। ১৯৯০-এর শেষের দিকে মরহুম আবুল কালাম আযাদ (প্রাক্তন সভাপতি, রাজবাড়ী জেলা)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পুনরুদ্দমে সংগঠনিক কার্যক্রমের মাঝে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হই। একই সময়ে পাবনা জেলা যুবসংঘের সভাপতি বেলালউদ্দিন ভাইয়ের সাথেও পরিচিত হই এবং তাঁর সাথে কাজ করতে থাকি। এ সময় আমি ও আমার সাথীরা বাইসাইকেলে করে পদ্মা নদীর ওপর পাড়ে বন্ধুর মেঠো পথ অতিক্রম করে পাবনার খয়েরসূতী গিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করতাম। এইভাবে কিছুদিন কাজ করার পর রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া পূর্ব জেলাকে সংযুক্ত করে বেলাল ভাইয়ের সহযোগিতায় যুবসংঘের কুষ্টিয়া পূর্ব সংগঠনিক জেলা গঠিত হয় ১৯৯১ সালের শেষের দিকে। যার প্রথম সভাপতি ছিলাম আমি। আমার বয়সসীমা অতিক্রম করায় যুবসংঘের দায়িত্ব ছেড়ে আন্দোলন-এর সহ-সভাপতি পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করি এবং সভাপতি হিসাবে আমার চাচা আলহাজ্জ মুস্তাকীমকে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। ১৯৯৫ সালে রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া সড়কের সবেমাত্র কাজ শুরু হয়। সম্পূর্ণ মাটির রাস্তায় সাইকেলে যাতায়াত বড়ই কষ্টকর ছিল, তবুও আল্লাহ্র রহমতে স্তিমিত হয়ে যাইনি। রাজবাড়ী জেলাকে সক্রিয় করতে যা কিছু প্রয়োজন সবই করেছিলাম এবং রাজবাড়ী জেলা যুবসংঘ কমিটি গঠন করতে সমর্থ হই। এই কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন আবুল হাশেম। শুরু হল নতুন উদ্যমে যুবসংঘের সাংগঠনিক কার্যক্রম। নন্দলালপুরকে ঢেলে সাজালাম আমরা। জুম'আর জামাতে দুই আযানের নিয়ম দূর করে এক আযান চালু করা হয় ১৯৯৩/৯৪ সালের জানুয়ারীতে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও নায়েবে আমীর আব্দুছ ছামাদ সালাফী সাহেবের বলিষ্ঠ ভূমিকার মাধ্যমে। যা আজও বিদ্যমান। ছালাতে জামা'আতবদ্ধভাবে মুনাজাত, মৃতকে কবরস্থ করার পর মিষ্টান্ন বিতরণ, চল্লিশা, কুলখানি, খতম পড়া ইত্যাদি বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছি। শবেবরাত উপলক্ষে হালুয়া-রুটি বিতরণ বন্ধ হয়েছে। বন্ধ হয়েছে ঈদুল ফিতরের দিন সমাজে সমাজে খিঁচুড়ী ভাত বিতরণ। *ফালিল্লাহিল হাম্দ*।

তাওহীদ ট্রাষ্টের অধীনে নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ পুনঃসংস্কার করে ২২০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বিশাল মসজিদ নির্মাণ করা হয় এবং বিদ'আতী দলসমূহের কার্যক্রম মসজিদে কঠোরহস্তে বন্ধ করা হয়। সবচাইতে যে কাজটি গুরুত্ববহ তা হল ছালাতের শৃংখলা ফিরিয়ে আনা। এই দীর্ঘ কর্মজীবনে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিদ'আতী দলের কর্মীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছি, গীবত-তোহমতের শিকার হয়েছি। একটি ধর্মীয় দল কিভাবে যে অন্য একটি ধর্মীয় সংগঠনের লাগামহীন সমালোচনা করে যায়, আমি ভেবে পাই না। আমীরে জামা'আত মিথ্যা মামলায় আটক হওয়ার পর আমরা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। পুলিশ, গোয়েন্দা বিভাগ, এমনকি স্থানীয়, চৌকিদার, দফাদার পর্যন্ত আমাদের উপর খবরদারি করেছে। নানাভাবে মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার অপকৌশল প্রয়োগ করেছে। ভয় দেখানো হয়েছে, জেএমবি বলে ধরিয়ে দেওয়ার। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদের কোন অপকৌশলই আমাদের বিরুদ্ধে কাজে আসেনি। বরং আমরা ছিলাম নির্ভীক সৈনিক, অটল হিমাদ্রীর মতো। সকলক্ষেত্রে আমরা আল্লাহ পাকের সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছি, কেটে গেছে অমানিশা। আমীরে জামা'আতকে মুক্ত করার জন্য সম্মেলন, মিছিল-সমাবেশ সব কিছুতেই আমরা কুষ্টিয়াবাসী ছিলাম অগ্রগামী। সেদিনের সেই স্মৃতি চির অম্লান থাকবে। নন্দলালপুর আহলেহাদীছদের একটি অতিপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রাম। কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছে নতুন নেতৃত্ব সেভাবে আসছে না। ফলে আমাদের কার্যক্রমে বেশ ভাটা পড়ে যাচ্ছে। আল্লাহ পাকের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, এখানে একজন বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য। যেন এই গ্রাম আবার জেগে ওঠে নতুন উদ্যমে। ফিরিয়ে আনতে পারে পুরাতন তাওহীদী ঐতিহ্য। আমীন!!

▪ *সহ-সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, কুষ্টিয়া (পূর্ব)।*

নিঃস্ব পদ্মার অব্যক্ত হাহাকার ও আমার মতিভ্রম

ওহীদা বেগম

আমার দুই সন্তানের মধ্যে ৮ বৎসরের আহমাদ সাজিদ ওশানই ছোট। জানার আগ্রহ খুব বেশী। চুপচাপ একা একা যে কোন কাজ করা তার খুব পছন্দ। কিন্তু এবারের কাজটি সে আর একা একা করতে পারলনা। সুদূর রাজশাহীতে নানাবাড়ি বেড়ানোর সুযোগ এলো। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বহতা তিন নদী পদ্মা, মেঘনা আর যমুনা– সেই কবেই না বইতে পড়েছে। ও আরও জানে গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে প্রমত্তা পদ্মা নদীর উৎপত্তি। তাই রাজশাহীতে নানাবাড়ি এসেই সে ধরল পদ্মানদী দেখবে। মামাতো ভাই আর ওকে নিয়ে গত ২১ মে'১১ তারিখে রাজশাহীর অহংকার সেই পদ্মা দেখতে গিয়েছিলাম। পদ্মার সেই ঐতিহ্যবাহী টি-বাঁধ, সেই উপচে পড়া ভীড়, সেই স্নিগ্ধ ফুরফুরে উদাস হাওয়া, সূর্যাস্তের সময় সেই মোহনীয় কল্লোলোক সবকিছুই আগের মত। কিন্তু আমার ছোট বেলার উত্তাল পদ্মা? সেই শো শো শব্দ, তীব্র ঘূর্ণিস্রোত, রং-বেরংয়ের পালতোলা নৌকার আনাগোনা–কই সেসব? না সবকিছু হারিয়ে প্রমত্তা পদ্মা আজ রিক্ত, নিঃস্ব। গভীরতা আগের মতই, বাঁধের ধার দিয়ে রাখা বন্যানিরোধের জন্য কংক্রিট বোল্ডারের সারি। কিন্তু পদ্মার মূল পরিচয়, মূল সম্পদ সেই জলধারার খোঁজ নেই। বাঁধ থেকে অন্ততঃ ৩০ গজ নীচে সুগভীর পদ্মার অভ্যন্তরে পানির পরিবর্তে কেবলই উসর ধূসর বালুকাসমুদ্র, অনায়াসে মহিষের দল তার বুক চিরে অতিক্রম করে যাচ্ছে। যেন প্রতিবেশী দেশের ফারাক্কা বাঁধের নির্মম ছোবলে গড়ে ওঠা বিশাল বাথান। আমার স্মৃতির এ্যালবামের সাথে গোধূলীলগ্নে দেখা এই দৃশ্য মেলাতে বড়ই কষ্ট হচ্ছিল। বহু দূরে পানির যে ক্ষীণধারা পরিদৃষ্ট হচ্ছে, তাতে কয়েকজন বাচ্চা ছেলে-মেয়ে হাঁটু পানিতে গোসল করছে। যেন এক ছোট্ট ডোবা বা মজা পুকুর। দশ বছর আগেও যেখানে অপর পাড়ের গ্রামগুলো প্রায় অস্পষ্ট রেখার মত মনে হত, আজ সেখানে মাত্র ৫০ গজ দূরেই উঁচু টিলার মত চরের উপর সবুজ গাছের সারি। আশ্চর্য! অস্তাচলে ঢলে পড়া সূর্যটা সাক্ষী দিচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি কিছুই অনিয়মের নয়, তাই সে সকালে উঠে এখন আবার পাটে যাচ্ছে। পরবর্তী সকালে সে আবার হাজিরা দেবে। কোন শক্তি তাকে আটকে রাখার নেই। কিন্তু পদ্মার পানি ফারাক্কা বাঁধ আটকে আছে, সে চাইলেও আসতে পারছেনা। হায়রে ফারাক্কা! যাকে একসময় আমরা সর্বনাশা পদ্মা বলতাম, যার উত্তাল তরঙ্গ দু'কূল ছাপিয়ে যেত, সেই পদ্মাকে তুমি আজ পানির পরিবর্তে ধু ধু বালুর নদীতে পরিণত করেছ। যদিও তুমি এ দেশের মানুষকে বন্যায় ডোবাতে আবারও পানি ছেড়ে দিতে পারো- এ আশংকায় আমাদের সরকার বাঁধের উপর অনেক বড় বড় পাথর মজুদ করে রেখেছে। হায়রে মানুষ, কেন তোমাদের এই বিচিত্র খেয়াল? কাউকে উপকার না কর, অপকার করোনা বন্ধু! আজ আমার সন্তানের কাছে আমি লজ্জিত, হয়ত বইয়ের কালো অক্ষরগুলো আজ ওর কাছে কেবল মিথ্যা গালগল্পমাত্র। রাজনীতির প্যাঁচ বোঝার বয়স ওর এখনও হয়নি, তবে এদেশের নাগরিক হয়ে ও যত বড় হবে ততই বুঝতে পারবে– বই মিথ্যা নয়, মিথ্যার শিকার শুধু হয়েছে বর্তমান সময়।

▪ *সহকারী শিক্ষিকা, নবজীবন ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা।*

কবিতা

তাওহীদের ডাক

-ইবাদুল্লাহ বিন আব্বাস
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা

শিরক-বিদ‘আত আর অপসংস্কৃতির বানে
ডুবন্ত যমীনের ঘন ঘোর তমিস্রা ঠেলে,
কে তুমি এলে আলোকবর্তিকা উঁচিয়ে
হেঁকে ঐ তাওহীদী হাঁক
তুমি তাওহীদের ডাক ॥

ঘুমন্ত যুবকের বিভ্রান্ত নেশায়
শিহরণ জ্বালা জাগিয়ে দিয়ে
তুড়ি মেরে নিদ্রা হাওয়ায় উড়িয়ে
দিলে যে মুক্তির অতুল স্বাদ
তুমি তাওহীদের ডাক॥

লেখকের লেখায়, গবেষকের গবেষণায়
বিজ্ঞানের বিজ্ঞানে, কবির কবিতায়
ভরিয়ে দিয়ে ফুলে-ফলে
আঁকলে যে হেথায় স্বপ্নরাগ
তুমি তাওহীদের ডাক॥

পূব আকাশের রাঙ্গা আবীরে
নবোদয়ের বীণ বাজিয়ে
সত্য সূর্যের প্রবল রোষে
বাতিলের যে চরম দুর্বিপাক
তুমি তাওহীদের ডাক॥

রবের সেনা

-ছানাউল্লাহ আব্বাসী
বাবুপুর, গোমস্তাপুর
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

শহীদী মরণ সেতো স্বপ্ন মুমিনের
ধরার বুকে লুটাবে কীর্তি তব রক্ত আখরের
পায় না এ সুধা বুজদিল সব মুনাফিক
লাঞ্ছনা এসে তারে দিয়ে যায় ধিক শত ধিক॥
মুনাফিক মৃত্যু এলো দেখে দেয় পিছুটান
মুনাফিক বলে, খরতাপে পুড়ে যাবে মোর ক্ষীণ প্রাণ॥
পিপাসা-ক্লান্তিতে মূর্ছা যায় দেহখানি ভার
ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-অশান্তি নিত্য সহচর তার
ওরে এ তোর সাথী হবে দিবানিশি জীবন ভরে
তাই বলি আয় ফিরে আবার ঈমানের বাতিঘরে॥
মুজাহিদ আমি– করি না কভু ভয় মৃত্যুকে
চলি ঈমান সড়কে হাতের মুঠোয় বেঁধে জীবনটাকে॥
জাহান্নাম অগ্নি তপ্ত ভীষণ
যেথা পুঁজ, রক্ত নদীর মিশন
ঝাক্কুমের ঘর্ষণ হেথা আর হামীমধারা অবিরাম
জীর্ণ-শীর্ণ হবে বসন, নেই কোন বিশ্রাম
তাই বলি, এস ফিরে জীর্ণ জরা ঝেড়ে
আমার রবের দুঃসাহসী বীর মুজাহিদ দলে॥

Alien Domain

-Md Mehadi Arif
Dhaka University

It's an alien domain,
It's a place of buying and selling oration,
Leave no stone unturned in the trade of fair,
The baskets full of speech becomes void,
Obnoxious words are accumulated in vacuum basket,
Dialects like rain fall in
Like a ploughshare or a market full of bullet
ammunition,
Pierced in the body.

This is not debate but bet,
Those who speak a few are mad,
Talkers are justified as skilful.
I am not Hanif Sandet,
Not a Loquacious Banglish RJ
Not a garrulous quack in the street
Not a money-hunter money plant.
Not a Sidr or Nargis like teacher who quakes in
the core of students' heart.
God in a fix seeing the stupid's tumult.

The fragile society can swallow nothing good,
If swallow, can't digest,
Ruminates like cow.
It is like a cow bazaar,
Fashionable fops inundate in the boat of bliss.
Flamboyant people are lucky indeed.
People for constant wear are fool fop or half fop.
How great the invention of civilization it is!

সংগঠন সংবাদ

নবঅনুমোদিত কর্মীদের শপথ গ্রহণ ও প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ১৩ ও ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ১৩ ও ১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে নব অনুমোদিত কর্মীদের শপথ গ্রহণ এবং দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সারাদেশ থেকে বিভিন্ন যেলার কর্মীরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, অত্র মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম প্রমুখ। বৃহস্পতিবার বাদ ফজর শুরু হয়ে শুক্রবার জুম'আর পূর্ব পর্যন্ত প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পরীক্ষায় ১ম হন আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ (রাজশাহী), ২য় আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া) ও ৩য় স্থান অধিকার করেন আহমাদুল্লাহ (কুমিল্লা)।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, যুবসংঘের চারটি কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান হ'ল সমাজ সংস্কার। এজন্য সবচেয়ে প্রয়োজন হ'ল চারটি বিষয় : ইলমী যোগ্যতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, নিরন্তর দাওয়াতী তৎপরতা ও ইমারতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও ভালোবাসা। যদি প্রতি যেলায় এ ধরনের নিবেদিতপ্রাণ কিছু কর্মী জান-মাল বাজি রেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের লক্ষ্যে ময়দানে কাজ করে, তাহ'লে এ সমাজ একদিন সত্যিকারের ইসলামী সমাজে পরিবর্তিত হবেই ইনশাআল্লাহ। তিনি 'যুবসংঘে'র নবমনোনীত কর্মীদের শুভেচ্ছা জানান ও তাদের জন্য দো'আ করেন।

সেমিনার

পাংশা, রাজবাড়ী ৭ অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ রাজবাড়ীর পাংশা উপযেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে **'আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে আহলেহাদীছ যুবসংঘের ভূমিকা'** শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পাংশা উপযেলা চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ হাসান আলী বিশ্বাস। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং 'যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবূল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাযযাক, যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক যাকির হোসাইন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আবু হেনাসহ বিভিন্ন এলাকা ও শাখার দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক সুধী যোগদান করেন।

প্রবাস সংবাদ

সিঙ্গাপুর ৬ নভেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় সিঙ্গাপুরের বুগী এলাকায় অবস্থিত সুলতান জাতীয় মসজিদে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিঙ্গাপুর শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (কুমিল্লা)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় বিষয় ভিত্তিক বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সহ-সভাপতি মু'আযেযম হোসেন (বগুড়া), সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফাকীরুল ইসলাম (মেহেরপুর), তাবলীগ সম্পাদক মাযহারুল ইসলাম (পটুয়াখালী), সহ-অর্থ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মানছূর (টাঙ্গাইল) এবং নতুন আহলেহাদীছদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ আলী (চুয়াডাঙ্গা), মুহাম্মাদ ফারূক হাসান (জয়পুরহাট) প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন আলেফ (জয়পুরহাট) এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন মুহাম্মাদ আতাউর রহমান (সিরাজগঞ্জ), মুহাম্মাদ হাবীব (টাঙ্গাইল) ও কাওছার হোসেন (কুমিল্লা)। আলোচনা সভায় ৫ জন ভাই নতুন 'আহলেহাদীছ' হন। তারা হ'লেন- ১. মাহামূদুল হাসান (কুমিল্লা), ২. অলীউল্লাহ (মাদারীপুর), ৩. মুস্তাফীযুর রহমান (চাঁদপুর), ৪. হাবীবুর রহমান (কুমিল্লা) ও ৫. শামসুদ্দীন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' সিঙ্গাপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মুকীত (কুষ্টিয়া)। অনুষ্ঠান সকাল ১০-টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৭-টা পর্যন্ত চলে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে সিঙ্গাপুরে 'যুবসংঘ'-এর ভাইদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের কাজ বেশ গতিশীলভাবে পরিচালিত হচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হাম্‌দ*। বিদেশ-বিভুঁইয়ে অতি ব্যস্ততার মাঝেও তারা দাওয়াতী কাজে নিয়মিত খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। প্রতিনিয়তই তারা সেখানে হক্বপন্থী মানুষের সাড়া পাচ্ছেন এবং প্রতি রোববার সাপ্তাহিক মিটিং-এ নতুন ভাইরা তাদের সাথে একাত্ম হচ্ছেন। বর্তমানে সেখানে মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর প্রায় ১৫০ কপির নিয়মিত গ্রাহক রয়েছেন। এছাড়া যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'ও সেখানে নিয়মিত যাচ্ছে। অবশ্য তাদের এই অগ্রযাত্রায় বিদ'আতপন্থী দলসমূহ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নানাভাবে তাদেরকে ভয়-ভীতি দেখিয়ে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। তবে সকল বাধা অতিক্রম করে সিঙ্গাপুর যুবসংঘ প্রতিদিনই নতুন নতুন অঞ্চলে তাদের দাওয়াত সম্প্রসারিত করে চলেছেন। তারা আমাদের দো'আপ্রার্থী।

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১

আগামী ৮ ও ৯ ডিসেম্বর রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর এক ঐতিহাসিক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য সম্মেলন ২০১১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। নিয়মিত এই সম্মেলনকে ঘিরে এবার এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ ছাড়াও এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ১৯৭৮ সাল তথা 'যুবসংঘ'-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকে অদ্যাবধি যেসকল সদস্য 'কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য' মানে উন্নীত হয়েছিলেন তাদের সকলকেই। এছাড়া সকল প্রাক্তন সভাপতি এবং বিশেষভাবে মনোনীত ৫ জন কাউন্সিল সদস্যকে সম্মাননা স্মারক প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। নানা আয়োজনে সম্মেলনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি। নতুন-পুরাতনের সমন্বয়ে এক অসাধারণ মিলনমেলায় পরিণত হতে যাচ্ছে বলে এ সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রত্যাশা তৈরী হয়েছে এবং কর্মীদের মাঝে উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সম্মেলন উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যা তাবলীগী ইজতেমা'২০১২ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সাম্প্রতিক মুসলিম বিশ্ব

মু'আম্মার গাদ্দাফীর রক্তাক্ত বিদায়

লিবিয়ার অবিসংবাদিত নেতা কর্ণেল মু'আম্মার আল-গাদ্দাফী সাম্রাজ্যবাদী ইহুদী-খৃষ্টানচক্রের সামরিক জোট 'ন্যাটো'র বিমান হামলায় গত ২০ অক্টোবর শেষ পর্যন্ত নিহতই হলেন। নিজ জন্মশহর সির্ত থেকে ২০ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৮-টার দিকে পালানোর চেষ্টা করেন গাদ্দাফী। এ সময় তার গাড়িবহরে বিমান হামলা চালায় ন্যাটো। হামলায় গাদ্দাফির গাড়ি বহরের ১৫টি ট্রাকই ধ্বংস হয় এবং আরোহী ৫০ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন গাদ্দাফী পুত্র মু'তাছিম ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবূবকর ইউনুস। তবে কয়েকজন সঙ্গীসহ গাদ্দাফী বেঁচে যান। তবে আহতবস্থায় তাকে গ্রেফতার করে বিদ্রোহী এনটিসি সদস্যরা। এসময় তার মাথা ও নাক দিয়ে রক্ত ঝরছিল। এরপর তাকে একটি গাড়ির বনেটের ওপর টেনেহেঁচড়ে তোলা হয়। আবার একইভাবে নামানো হয়। এ সময় একজন তার মাথা বরাবর বন্দুক তাক করে গুলী করলে তিনি নিহত হন। তাঁর লাশ মিসরাতা শহরের এক বাজারে বড় একটি গোশত রাখার হিমঘরে রাখা হয়। ৪ দিন যাবৎ সন্তানসহ তাঁর লাশ প্রদর্শনীর জন্য ফেলে রাখা হয়। অতঃপর লাশে পচন ধরলে পঞ্চম দিনে লোক চক্ষু এড়িয়ে মরুভূমির এক অজ্ঞাত স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। এভাবে ১৯৮৬ সাল থেকে পশ্চিমাদের টার্গেটে থাকা গাদ্দাফীর দীর্ঘ ৪২ বছরের অধিক শাসনের অধ্যায়ের করুণ পরিসমাপ্তি ঘটে।

গাদ্দাফীর শেষ অছিয়তটি ছিল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর লিখিত ওছিয়ত এভাবে পাওয়া গেছে–'এটি আমার অছিয়ত। আমি মু'আম্মার বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুস সালাম আল-ক্বাযযাফী এই মর্মে শপথ করছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমি একজন মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করব। যদি আমি নিহত হই, তাহ'লে আমি মুসলিম রীতি অনুযায়ী সমাধিস্থ হতে চাই আমার মৃত্যুকালীন পোষাকে গোসল না করা অবস্থায় (আমার জন্মস্থান) সির্তের পারিবারিক গোরস্থানে। আমি চাই যে, আমার মৃত্যুর পরে আমার পরিবার বিশেষ করে নারী ও শিশুদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা হবে। লিবীয় জনগণ যেন এর ঐক্য, উন্নতি, ইতিহাস এবং তাদের পূর্বপুরুষ ও বীরদের ভাবমূর্তি রক্ষা করে। লিবীয় জনগণের উচিৎ হবে না তাদের স্বাধীন ও সর্বোত্তম ব্যক্তিদের উৎসর্গ সমূহকে বর্জন করা। আমি আমার সমর্থকদের আহ্বান জানাচ্ছি, লিবিয়ার উপর বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আজ, কাল ও সর্বদা প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য। বিশ্বের স্বাধীন মানুষেরা জেনে নিক যে, আমরা আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল জীবনের জন্য সবকিছু কুরবানী দিতে পারি। আমরা এর বিনিময়ে অনেক কিছুর প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কর্তব্য ও সম্মানের প্রতীক হিসাবে সম্মুখভাগে থেকে মুকাবিলার পথকে বেছে নিয়েছিলাম।. এখুনি যদি আমরা জিততে নাও পারি, তবুও আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটি শিক্ষা রেখে যাব যে, জাতিকে রক্ষা করা হ'ল সম্মানজনক কাজ এবং একে বিক্রি করে দেওয়া হ'ল সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা। ইতিহাস চিরদিন তাদের স্মরণ করবে, অন্যেরা তোমাদের যেভাবে বলার চেষ্টা করুক না কেন'।

তিউনিশিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত : আন-নাহযা পার্টির বিজয়

প্রায় ১০ মাস আগে তিউনিসিয়ায় ঘটে যায় তথাকথিত জেসমিন বিপ্লব। বিপ্লবের শেষদিকে অবস্থা বেগতিক দেখে স্বৈরাচারী শাসক যায়নুল আবেদীন বিন আলী জানুয়ারীর ১৪ তারিখ সঊদী আরব পালিয়ে যান। তারপর মাত্র ৯ মাসের মধ্যে গত ২৩ শে অক্টোবন দেশটিতে হয়ে গেল প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রথম সাংবিধানিক পরিষদ নির্বাচনে আনুষ্ঠানিকভাবে মধ্যপন্থী ইসলামিক দল 'আন নাহযা'কে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। উক্ত ফলাফলে দেখা যায়, নাহযা ৪১ শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়ে মোট ২১৭টি আসনের মধ্যে ৯০টি আসনে জয়ী হয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় ধর্মনিরপেক্ষ দল কংগ্রেস প্রজাতন্ত্র (সিপিআর) ১৪ শতাংশের কাছাকাছি ভোট পেয়ে ৩০টি আসন জিতেছে। আর ১০ শতাংশ ভোটে ২১টি আসন নিয়ে তৃতীয় হয়েছে বামপন্থী ইত্তাকাতোল। আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর আন নাহযার প্রধান রশিদ ঘানুসি বলেন, ''নতুন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তিউনিসিয়ার প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা হবে।'' নাহযা পার্টির এক মুখপাত্র বলেন, তারা ক্ষমতায় গেলে তিউনিশিয়াকে মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবে। মাদক নিষিদ্ধ করা হবে না বা বিদেশীদেরকে সী বীচে বিকিনি পরিধান নিষিদ্ধ করা হবে না। ইসলামী ব্যাংকিংকে বাধ্যতামূলক করা হবে না। কেননা তাঁর মতে তিউনিসিয়া সবার দেশ। রশিদ ঘানুসির ভাষায়– '..in which the rights of God, the Prophet, women, men, the religious and the non-religious are assured because Tunisia is for everyone' এখানে আল্লাহ, মুহাম্মাদ (ছাঃ), নারী, পুরুষ ধার্মিক, অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের অধিকার নিশ্চিত করা হবে, যেহেতু তিউনিসিয়া সকলের' *(বিবিসি নিউজ, ২৭ অক্টোবর'১১)*।

মরক্কোয় ইসলামপন্থী দল পিজেডির জয়লাভ

মরক্কোর সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থী জাস্টিস এন্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা পিজেডি জয়লাভ করেছে। ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পিজেডি ১০৭টি আসন পেয়েছে অর্থাৎ মরক্কোর সংসদের ৩৯৫টি আসনের মধ্যে এক চতুর্থাংশ আসনে তারা বিজয়ী হয়েছে। মরক্কোর তিনটি রাজনৈতিক দল মিলে 'সেকুলার ফ্রন্ট' নামে জোট গঠন করেছিল। এ ফ্রন্ট নির্বাচনে ১১৭টি আসন পেয়েছে। নির্বাচনে মোট প্রার্থী ছিলেন সাত হাজার। আর যে সব দল সাধারণ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে তারা দেশটির রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকার বিষয়টি মেনে নিয়েছে। ফলে অন্যান্য দলের সঙ্গে পিজেডি' জোট সরকার গঠন করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

পিজেডির প্রধান আব্দুল্লাহ বিন কিরানে বলেছেন, গণতন্ত্র ও সুশাসন নিশ্চিত করতে অন্য দলগুলোকে নিয়ে জোট সরকার গঠন করা হবে। পিজেডি ঘোষণা দিয়েছে, তারা ইসলামের কোনো বিধান চাপিয়ে দেবে না। বরং তারা ইসলামী অর্থনীতি অনুসরণ করে দেশকে উন্নয়ন, অধিকতর সমবন্টন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা করবে। তবে মাদক এবং মহিলাদের পর্দার মত বিষয়গুলোতে তারা কোন মতামত দেবে না, কেননা মরক্কো পর্যটকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান *(বিবিসি নিউজ, ২৭ নভেম্বর'১১)*। তারা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র মেনে নিয়েছে। এ ব্যবস্থায় বাদশাহ কেবল শাসনতান্ত্রিক প্রধান হবেন। দেশ পরিচালনা করবে পার্লামেন্ট এবং মন্ত্রীসভা।

মিসরে ইসলামপন্থী দলগুলোর একচেটিয়া সাফল্য

মিসরে সংসদ নির্বাচনের প্রথম দফা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৮ নভেম্বর। নির্বাচনে মিসরের জনপ্রিয় ইসলামী দল 'মুসলিম ব্রাদারহুড' নিয়ন্ত্রিত 'ফ্রীডম এণ্ড জাস্টিস পার্টি' ৩৭% ভোট পেয়ে নিশ্চিত বিজয়ের পথে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে গঠিত সালাফী সংগঠন আন-নূর পার্টি ২৪% ভোট পেয়ে ২য় স্থানে রয়েছে। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি লাভ করেছে ১৩% ভোট। ৬০%-এর বেশী ভোট পাওয়ায় নির্বাচনে ইসলামপন্থী জোট নিশ্চিতভাবেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে যাচ্ছে। কেননা এখনো পর্যন্ত দেশের যে দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চলে নির্বাচন হয়নি সেসব অঞ্চলের অধিকাংশ ভোটারই ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থক। আগামী জানুয়ারীতে পরবর্তী দফা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ

১. প্রশ্ন : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১ অনুসারে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় কত ?
উত্তর : ৮১৮ মার্কিন ডলার।
২. প্রশ্ন : ২০১১ সালের পঞ্চম আদমশুমারীর প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?
উত্তর : ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার।
৩. প্রশ্ন : পঞ্চম আদমশুমারীর প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী আয়তনে ক্ষুদ্রতম জেলা কোনটি?
উত্তর : নারায়ণগঞ্জ।
৪. প্রশ্ন : পঞ্চম আদমশুমারীর প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী আয়তনে বৃহত্তম জেলা কোনটি?
উত্তর : রাঙ্গামাটি।
৫. প্রশ্ন : দেশের অষ্টম সিটি কর্পোরেশন্ কোনটি?
উত্তর : কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন।
৬. প্রশ্ন : তিস্তা নদীর উৎসমুখে ভারত কবে, কোথায় ব্যারাজ নির্মাণ করে?
উত্তর : ১৯৮৫ সালে ; গজলডোবা (ভারত)।
৭. প্রশ্ন : বর্তমানে কতটি দেশে বাংলাদেশের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে?
উত্তর : ৮৬ টি দেশে।
৮. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ৬০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ মাত্রা ও দীর্ঘস্থায়ী ভূ-কম্পন অনুভূত হয়?
উত্তর : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১১ (এ ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভারতের সিকিম রাজ্যের রাজধানী গাংটক)।
৯. প্রশ্ন : ৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ ভারতের কোন রাজ্য সরকার বাংলাকে সেখানকার দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
উত্তর : ঝাড়খণ্ড রাজ্য।
১০. প্রশ্ন : ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশে সন্ধান পাওয়া নতুন জলপ্রপাতের নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : হামহাম জলপ্রপাত, মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার ইসলামপুর ইউনিয়নে।
১১. প্রশ্ন : বাংলাদেশের ৩৪তম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম কি?
উত্তর : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (গোপালগঞ্জ)।
১২. প্রশ্ন : বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন (BPSC)-এর ১২তম এবং বর্তমান চেয়ারম্যান কে?
উত্তর : এ টি আহমেদুল হক চৌধুরী।
১৩. প্রশ্ন : ১৫ নভেম্বর ২০১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করে?
উত্তর : বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়া)।
১৪. প্রশ্ন : ১৫ নভেম্বর ২০১১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করে?
উত্তর : বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়া)।
১৫. প্রশ্ন : মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশী বীরপ্রতীক ডব্লিউ এ এস ওডারল্যাণ্ডের সমাধি কোথায়?
উত্তর : কেরাকাঁটা, পার্থ, অস্ট্রেলিয়া।
১৬. প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে থানা ও উপজেলার সংখ্যা কতটি?
উত্তর : ৩১৩ ও ৪৮৪ টি।
১৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশে বর্তমানে গ্যাসক্ষেত্র কতটি?
উত্তর : ২৪ টি।
১৮. প্রশ্ন : সর্বশেষ (২৪তম) সন্ধান পাওয়া গ্যাসক্ষেত্র কোনটি?
উত্তর : সুন্দলপুর গ্যাসক্ষেত্র (নোয়াখালী)।
১৯. প্রশ্ন : বাংলাদেশের প্রথম সার্চ ইঞ্জিন-এর নাম কি?
উত্তর : পিপীলিকা (Pipilika)।
২০. প্রশ্ন : ২৫ অক্টোবর ২০১১ কোন পাঁচটি জেলাকে ফাইলেরিয়ামুক্ত ঘোষণা করা হয়?
উত্তর : রাজশাহী, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা ও মেহেরপুর।

সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক

১. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বে স্বাধীন দেশের সংখ্যা কতটি এবং সর্বশেষ স্বাধীন দেশের নাম কি?
উত্তর : ১৯৫ টি, দক্ষিণ সুদান।
২. প্রশ্ন : দক্ষিণ সুদানকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ কোনটি?
উত্তর : সুদান।
৩. প্রশ্ন : বর্তমানে বিশ্বে কয়টি দেশে মূল্য সংযোজন কর (VAT) চালু আছে?
উত্তর : ১৪৪ টি।
৪. প্রশ্ন : OIC-এর নতুন এবং বর্তমান পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : Organisation of Islamic Co-oparation.
৫. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বাধিক নিরক্ষর অধ্যুষিত দেশগুলোকে কি বলে অভিহিত করা হয়?
উত্তর : E-9 Countries (দেশগুলো- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, চীন, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, নাইজেরিয়া, ব্রাজিল ও মেক্সিকো)।
৬. প্রশ্ন : লিবিয়ার গ্রীন স্কয়ারের বর্তমান নাম কি?
উত্তর : শহীদী স্কয়ার।
৭. প্রশ্ন : বিশ্বের সর্বাধিক দ্বীপ রাষ্ট্রের নাম কি?
উত্তর : ইন্দোনেশিয়া।
৮. প্রশ্ন : ২০১১-১২ সালে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় প্রথম হয়েছে কোনটি?
উত্তর : ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি (যুক্তরাজ্য)।
৯. প্রশ্ন : জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের বর্তমান প্রধান কে?
উত্তর : হার্ভ ল্যাডসস (ফ্রান্স)।
১০. প্রশ্ন : বিশ্বের প্রথম নারী হিসেবে কে কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়া সর্বোচ্চ ১৪টি চূড়া জয় করেছেন।
উত্তর : গারসন্ড কালটেনব্রানার (অস্ট্রিয়া)।
১১. প্রশ্ন : বিশ্বের দীর্ঘতম গুহা নেটওয়ার্ক কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : ভিয়েতনাম।
১২. প্রশ্ন :পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী কফি উৎপন্ন হয় কোন দেশে?
উত্তর : ব্রাজিলে।
১৪. প্রশ্ন : তুরস্কের রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত বার্তা সংস্থার নাম কি?
উত্তর : আনাতোলিয়া।
১৫. প্রশ্ন : বিশ্বের কোন দেশ অভিবাসী গ্রহণে শীর্ষে রয়েছে?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র (দ্বিতীয় রাশিয়া)।
১৬. প্রশ্ন : সার্কভুক্ত দেশগুলোয় ভিসামুক্ত পদ্ধতি চালুর প্রস্তাবক কোন দেশ?
উত্তর : পাকিস্তান।
১৭. প্রশ্ন : আরব বিশ্বের গণঅভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল কোন শহর থেকে?
উত্তর : সিদি বউজিদ, তিউনিসিয়া।
১৮. প্রশ্ন : মিসরে হোসনি মোবারক বিরোধী আন্দোলনের সূতিকাগার কোন স্থান?
উত্তর : তাহরীর স্কয়ার।
১৯. প্রশ্ন : ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল ‘এননাহদা (Ennahda)’ কোন দেশের?
উত্তর : তিউনিসিয়া।
২০. প্রশ্ন : ২০১১ সালের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ১৪৬তম।

আইকিউ

[কুইজ-১ ও কুইজ-২ এর সঠিক উত্তর লিখে নাম-ঠিকানাসহ ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সর্বোচ্চ উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। -বিভাগীয় সম্পাদক]

কুইজ-১ :

১. কুরআনের কোন সুরায় 'মিম' নেই এবং প্রতিটি আয়াত 'রা' দ্বারা শেষ হয়েছে?

ক. সূরা আলাক্ব, খ. সূরা আছর, গ. সূরা কাওছার, ঘ. সূরা তাকাছুর।

২. কুরআনে الله শব্দটি কতবার এসেছে?

ক. ২৬৯৯, খ. ২৫৯৯, গ. ২৪৯৯, ঘ. ২৩৯৯।

৩. কুরআনে محمد নামটি কতবার এসেছে?

ক. ৫ বার, খ. ৬ বার, গ. ৭ বার, ঘ. ৪ বার।

৪. কুরআনে কোন নবীর নাম সর্বাধিক এসেছে?

ক. মূসা (আঃ), খ. ঈসা (আঃ), গ. ইবরাহীম (আঃ), ঘ. আদম (আঃ)।

৫. কুরআনে জান্নাত ও জাহান্নাম শব্দটি যথাক্রমে কতবার এসেছে?

ক. ৬৬ ও ৭৭ বার, খ. ৮৮ ও ৯৯ বার, গ. ৬০ ও ৭০ বার, ঘ. ৫৩ ও ৫৭ বার।

৬. কোন আরব দেশের নাম কুরআনে এসেছে?

ক. সিরিয়া, খ. মিসর, গ. ফিলিস্তীন, ঘ. ইরাক।

৭. হিজরী সন গণনা শুরু হয় ইংরেজী কত সাল থেকে?

ক. ৬২০ খৃঃ, খ. ৬২২ খৃঃ, গ. ৬২৪ খৃঃ, ঘ. ৬২৬ খৃঃ।

৮. কোন মুসলিম শাসককে প্রথম 'আমীরুল মু'মিনীন' লকব দেয়া হয়?

ক. আবু বকর (রাঃ), খ. উমার (রাঃ), গ. উছমান (রাঃ), ঘ. আলী (রাঃ)।

৯. ইসলামের প্রথম রাষ্ট্রদূতের নাম কি?

ক. খাব্বাব (রাঃ), খ. আলী (রাঃ), গ. উছমান (রাঃ), ঘ. উমর (রাঃ)।

১০. নিম্নে কোনটি জিহ্বা ছাড়াই কথা বলে?

ক. গাড়ি, খ. ঘড়ি, গ. পানি, ঘ. নদী।

কুইজ-২ :

১. আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে?

ক. মুত্তাকী, খ. মুছল্লী, গ. উত্তম আচরণকারী, ঘ. সত্যবাদী।

২. পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে আত্মসমালোচনার কথা এসেছে?

ক. হাশর ১৮, খ. কাহাফ ৭ গ. নূর ১৫, ঘ. ছফ ৫।

৩. ১২ ইমামে বিশ্বাস করে কারা?

ক. শিআরা, খ. কাদিয়ানীরা, গ. রাফেযীরা, ঘ. ব্রেলভীরা।

৪. 'যুবসংঘ'-এর ১ম দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন কবে হয়?

ক. ২৫ অক্টোবর ১৯৯৬, খ. ২৩ অক্টোবর ১৯৯৪, গ. ২০ নভেম্বর ১৯৯৭, ঘ. ১ ডিসেম্বর ২০০০।

৫. মুসলিম সমাজে তাক্বলীদের প্রসার শুরু হয় কখন থেকে?

ক. ২০০ হিজরী। খ. ৩০০ হিজরী। গ. ৪০০ হিজরী। ঘ. ৫০০ হিজরী।

৬. আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কত সালে পিএইচ-ডি ডিগ্রী লাভ করেন?

ক. ২০ আগস্ট ১৯৯২। খ. ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১। গ. ২০ জুন ১৯৯২। ঘ. ২০ আগস্ট ১৯৯২।

৭. মিসরের ১ম দফা নির্বাচন কবে অনুষ্ঠিত হয়?

ক. ২৮ নভেম্বর ২০১১, খ. ২৫ নভেম্বর ২০১১, গ. ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০১১, ঘ. ২০১১।

৮. বসনিয়া কত সালে স্বাধীনতা লাভ করে?

ক. ১ মার্চ ১৯৯২, খ. ২০ জুন ১৯৯২, গ. ১১ জুলাই ১৯৯৫, ১৫ জুলাই ১৯৯৫।

৯. দেশের ৫ম আদম শুমারী মতে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?

ক. ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার, খ. ১৫ কোটি ২৯ লক্ষ ২০ হাজার, গ. ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ। ঘ. ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ।

১০. দেশের মোট উপযেলার সংখ্যা কতটি?

ক. ৪৮৪টি। খ. ৩৩১টি। গ. ৫২০টি। ঘ. ৪৭৩টি।

(উত্তরের জন্য বর্তমান সংখ্যাটি দেখুন)

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ী ৩ জন

প্রথম: জান্নাতুল ফেরদাউস
কাকিলাদহ, মিরপুর, কুষ্টিয়া।

দ্বিতীয়: মেহেদী হাসান
৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

তৃতীয়: সাখাওয়াত হোসেন
৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

গত সংখ্যার কুইজ (১) -এর সঠিক উত্তর

১. ক, ২. ক, ৩. ঘ, ৪. ঘ, ৫. ক, ৬. ক ৭. খ ৮. খ, ৯. গ্রীনল্যাণ্ড, ১০. দারুস সালাম।

গত সংখ্যার কুইজ (২) -এর সঠিক উত্তর

১. ক, ২. ক, ৩. গ, ৪. খ, ৫. ক, ৬. খ, ৭.ঘ, ৮. ক, ৯. ক, ১০, ক।

শব্দজোট :

{শব্দজোটটি পূরণ করে নাম-ঠিকানাসহ ৩০শে ডিসেম্বরের মধ্যে পাঠিয়ে দিন। সঠিক উত্তরদাতাদের তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। এবারের শব্দজটটি তৈরী করেছেন আরব আলী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাবি}

■	১		২		৩	■	৪
৫		■		■		■	
৬			■	৭		■	
	■	■	৮		■	৯	
১০	১১		■		■	১২	
১৩		■	১৪	■	■	১৫	
১৬		■		■	১৭	■	
	■	১৮					■

পাশাপাশি : ১. পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত। ৫. বাড়ি-ঘর তৈরীর জন্য অপরিহার্য বস্তু। ৬. বন বিষয়ক। ৭. প্রচুর সম্পদের মালিক। ৮. দেহ, শরীর। ৯. পরাজয়। ১০. ধ্যানে মগ্ন থাকেন যিনি। ১২. ইতালির মুদ্রা। ১৩. কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে সংক্ষেপে বলা হয়। ১৫. হাড়ের ভেতর চর্বিজাতীয় নরম পদার্থ। ১৬. বন্ধু, সুহৃদ। ১৮. পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি।

উপর-নীচ : ১. সুতলির ইংরেজী নাম। ২. একটি সংখ্যা। ৩. রাত/নিশি। ৪. বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন। ৫. চতুর্দশ শতকের বিখ্যাত মুজাদ্দিদ যিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। ৭. তীর নিক্ষেপের যন্ত্র বিশেষ। ৯. ফেরীওয়ালার একটি জনপ্রিয় খাবার। ১১. পরিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন। ১৪. সুখ, হর্ষ। ১৭. নতুন।

গত সংখ্যার শব্দজোট বিজয়ী ৩ জন

প্রথম: আহমাদ সাজিদ
২য় শ্রেণী, নবজীবন ইনস্টিটিউট, সাতক্ষীরা।

দ্বিতীয়: আসাদুল্লাহ আল-গালিব
৬ষ্ঠ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

তৃতীয়: আব্দুল হাকীম
৮ম শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

গত সংখ্যার শব্দজট-এর সঠিক উত্তর

পাশাপাশি : ১. দ্বীন, ২. রব, ৪. আন্দোলন, ৭. চাপ, ১০.রাত্রী, ১৪. সোনামণি। ১৬. পিতা। ১৭. ধর্ম।

উপর-নীচ : ১. দ্বীপ, ৩. বই ৪. আম, ৫. নদী, ৬. সাবা, ৭. চারা, ৮. পত্রী, ৯. ঈদ, ১১. এসো, ১২. পাণি, ১৩. টুপি, ১৫. কর্ম।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১২

হে নবী! আপনি বলে দিন,
যারা জানে আর যারা
জানে না তারা কি সমান?
উপদেশ গ্রহণ করে কেবলমাত্র
তারাই যারা বুদ্ধিমান।
(সূরা যুমার ৯)

ক গ্রুপ (উন্মুক্ত) :

গ্রন্থ : আহলেহাদীছ আন্দোলন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতসহ)

লেখক : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

খ গ্রুপ (৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) :

গ্রন্থ : নবীদের কাহিনী ১ম ও ২য় খণ্ড

লেখক : ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার

ক গ্রুপ :	খ গ্রুপ :
১ম পুরস্কার : ৫০০০/=	১ম পুরস্কার : ৩০০০/=
২য় পুরস্কার : ৪০০০/=	২য় পুরস্কার : ২৫০০/=
৩য় পুরস্কার : ৩০০০/=	৩য় পুরস্কার : ২০০০/=
বিশেষ পুরস্কার : ৫টি	বিশেষ পুরস্কার : ৫টি

নিয়মাবলী

- **রেজিস্ট্রেশনের তারিখ :**
  ১৫ জানুয়ারী থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১২
- **রেজিস্ট্রেশন ফি :**
  ৫০ টাকা
- **প্রতিযোগিতার তারিখ :**
  ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০১২ শুক্রবার, সকাল ১০-১১টা
  তাবলীগী ইজতেমা ২০১২-এর ২য় দিন
- **প্রশ্নপদ্ধতি ও মানবন্টন :**
  সময় : ১ ঘণ্টা
  এমসিকিউ প্রশ্ন মোট ১০০টি
  মোট নম্বর ১×১০০ = ১০০
  (প্রত্যেকটি ভুল উত্তরের জন্য নম্বর ০.৫ কর্তিত হবে)
- **প্রতিযোগিতার স্থান :**
  কেন্দ্রীয় কার্যালয়
  বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
- **পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান :**
  তাবলীগী ইজতেমার ২য় দিন বাদ এশা

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন: ০৭২১-৮৬১৬৮৪